বৈজ্ঞানিক উপায়ে
ছাগল ও ভেড়া পালন

বায়োটেক কিষাণ হাব প্রকল্প

গবেষণা সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণ

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

৬৮, ক্ষুদিরাম বসু সরণী, কলকাতা-৭০০ ০৩৭

এবং মোহনপুর, নদীয়া

দূরভাষ ও ফ্যাক্স : (০৩৩) ২৫৫৬-৩৩৯৬

ওয়েব সাইট : **wbuafscl.ac.in**

বায়োটেক কিষাণ হাব প্রকল্প
জৈব প্রযুক্তি বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

© পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশনা ঃ
গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণ

সংকলন ঃ
ডাঃ কেশবচন্দ্র ধারা

প্রথম প্রকাশ ঃ **নভেম্বর, ২০১৮**

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
শিল্পা ঘোষ, সায়ন্তনী বোস এবং কৌস্তভ পোদ্দার

মুদ্রণে ঃ
গৌরি প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৬বি, পি. কে. বিশ্বাস রোড, বিশ্বাস পাড়া
খড়দহ, কলকাতা-৭০০ ১১৭
মোবাইল : ৯৩৩১২ ০৯৬৫৫

কিছু কথা

খামারীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় ব্যবহৃত প্রযুক্তির সাথে বিজ্ঞান মেশাতে পারলে বাড়বে উৎপাদন এবং সেই উৎপাদন হবে স্থিতিশীল। তাই প্রাণীসম্পদের স্থিতিশীল উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যতম প্রয়োজন খামারীকে উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত করা। সহজ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা পারে খামারীর চেতনার উন্মেষ ঘটাতে—তাঁকে প্রশিক্ষিত করতে "বৈজ্ঞানিক ছাগল ও ভেড়া পালন"—এরকমই একটি প্রয়াস। সামগ্রিক ভাবে জীবন ও জীবীকার স্বার্থে প্রাণী পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কৃষি জমির অপ্রতুলতা ও কৃষি থেকে আয়ের সীমাবদ্ধতা কৃষক বন্ধুদের প্রাণীপালন বিশেষ করে ছাগল ও ভেড়া পালনে উৎসাহিত করছে। গ্রাম বাংলার মা বোনেরা বাড়ির নিত্য কাজ সম্পন্ন করার পাশাপাশি অত্যন্ত সহজেই কয়েকটি ছাগল পালন করে সংদ্বারের আর্থিক স্বচ্ছতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রাম বাংলার কৃষক ছাগ-পালকদের চাহিদাকে মাথায় রেখে বর্তমানে এই পুস্তকটি প্রকাশ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে সুন্দরবনের মানুষের জীবিকার সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত ছাগল ও ভেড়া পালন। বাংলার কালো ছাগল বা গাড়োল ভেড়া পালনের চাহিদা আছে কিন্তু প্রয়োজন সঠিক পরিচর্যা ও উন্নত মানের প্রাণী নির্বাচন। বর্তমান প্রকাশনাটিতে এই বিষয়গুলি যথাসম্ভব গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারত সরকারের জৈব প্রযুক্তি বিভাগের প্রকল্প 'বায়োটেক কিষাণ হাব'-এর মাধ্যমে প্রকাশিত বর্তমান পুস্তিকা খামারী বন্ধুদের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠবে তাঁদের জীবন ও জীবিকা সন্ধানে।

প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই গঠনমূলক সমালোচনা বর্তমান প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

কেশবচন্দ্র ধারা
সহ-অধিকর্তা (খামার) ও
মুখ্য প্রকল্প পরিদর্শক,
বায়োটেক কিষাণ হাব, কলকাতা

বেলগাছিয়া
কোলকাতা-৩৭

সূচীপত্র

১	ছাগল পালন	৭
২	ভেড়া পালন	২০
৩	পুষ্টি ও খাবার	২৬
৪	ছাগল ও ভেড়ার রোগ এবং তার প্রতিকার	৩৬
৫	ছাগল ও ভেড়ার মাংসের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ	৫৫
৬	ছাগল/ভেড়া পালনের প্রকল্প	৫৭
	পরিশিষ্ট	৬৭

১

ছাগল পালন

❑ **ভূমিকা ঃ** জীবীকার লক্ষ্যে যে সমস্ত প্রাণী পালন করা হয়ে থাকে তার মধ্যে ছাগল পালন অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকে গ্রামের মানুষ সামাজিক ও আর্থিক সুবিধার জন্য ছাগল পালন করে আসছে। ছাগলকে গরীব মানুষের গরু (Poor man's Cow) বলা হয়, কেননা তাদের অর্থনীতিতে ছাগলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ থেকে ছাগল পালন করে আসছে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতার শিলমোহরে ছাগলের ছবি পাওয়া গেছে। পশ্চিমবাংলার উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ছাগল খুব সহজেই পালন করা যায়। ছাগল পুষতে খরচ কম, লাভ বেশি, ঝামেলাও কম। কথায় বলে ছাগলে কিনা খায় অর্থাৎ ছাগলের খাবারে কোনপ্রকার বাছ-বিচার নেই। বাংলার দেশী ছাগল একসাথে ২-৩টি বাচ্চা দিতে পারে। মাত্র ৬-৭ মাস বাচ্চাকে পালন করলে ৭-৮ কেজি ওজন হয়।

মাংস, চামড়া, দুধ, লোম ও সারের জন্য ছাগলের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। পাহাড়ি অঞ্চলে হালকা মাল বহন করার উদ্দেশ্যে ছাগলকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ছাগলের মাংসের চাহিদা ও বাজার সর্বত্র। এছাড়া ছাগলের দুধ খুব সহজেই হজম হয় এবং পুষ্টিকর। অজীর্ণ রোগ, পেপটির আলসার, অম্লরোগ ও লিভারের প্রদাহে ছাগল দুধ ভীষণ উপকারী। তাছাড়া বাংলার কালো ছাগলের চামড়া পৃথিবী বিখ্যাত এবং অত্যন্ত দামী।

তবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উন্নত প্রথায় ছাগল পালন অনেক বেশি লাভজনক। তার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা, ভাল খাবারের ব্যবস্থা করা ও স্বাস্থ্যের প্রতি একটু বেশি দৃষ্টি দেওয়া। বর্তমানে বহু বেকার যুবক ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে ছাগল পালন করে লাভবান হচ্ছেন। ডিপলিটার পদ্ধতিতে ছাগল পালন করেও লাভ করা যায়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর জীবিকার চাহিদা মেটাতে ছাগল পালন এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। গ্রামাঞ্চলে ছাগল পালনের দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে আর্থ-সামাজিক দিক দেখলে কৃষি সংক্রান্ত উদ্যোগের চাইতে ছাগল পালনে আর্থিক লাভ বেশি হয়। এছাড়া সহায়ক আয়ের দিক থেকে ছাগল পালন পূর্ব থেকেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাছাড়া এদের আকার ছোট হওয়ার জন্য জায়গা কম লাগে ও সহজে পালন করা যায়। বাড়ির মহিলা ও কমবয়সী ছেলেমেয়েরাও সহজভাবে এদের পালন করতে পারে।

● **সংখ্যাতত্ত্ব ঃ** মোট ছাগল সংখ্যায় ভারত পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। ভারতে প্রায় ১২ কোটি ছাগল (১৯৯৩) আছে যেখানে পৃথিবীতে মোট ছাগলের সংখ্যা ৭৫ কোটি অর্থাৎ সারা বিশ্বের মোট

ছাগলের সংখ্যার ১৬ ভাগ। আবার এই ছাগলের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ দেশী জাতের ছাগল। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছাগল ও তার নানা প্রজাতি ভারতের অমূল্য সম্পদ যা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দেড় কোটি ছাগল আছে ১৯৯৩ সালের হিসাব অনুযায়ী, যেখানে ১৯৭২ সালে ঐ সংখ্যা ছিল ৫২ লক্ষ, ১৯৭৭ সালে ৭৩ লক্ষ, ১৯৮৪ সালে ১ কোটি ৯ লক্ষ ও ১৯৮৯ সালে ১ কোটি ১৮ লক্ষ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবাংলার ছাগল পালন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। জেলার ক্ষেত্রে ১৯৮৯ সাল অনুযায়ী মেদিনীপুরে সাড়ে তের লক্ষ, দঃ ২৪ পরগণায় ১১ লক্ষ ও মুর্শিদাবাদে সাড়ে ১১ লক্ষ ছাগল আছে। তবে বাংলার প্রায় সব জেলাতেই ছাগল পালন করা হয়।

● ছাগল পালনের উদ্দেশ্য ঃ

✶ ছাগল প্রধানত মাংসের জন্য পালন করা হয়। ভারতে ছাগলের মাংস বেশি পছন্দের। ছাগলের মাংসের নাম **চিভন** (Chivon)। ভারতে জাতি, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে প্রায় সকলেই এই মাংস পছন্দ করে এবং এর দামও খুব বেশি। বাংলার কৃষ্ণকায় বা কালো ছাগলের মাংস খুব সুস্বাদু ও জনপ্রিয়। ভারতের মোট মাংস উৎপাদনের ১৬ ভাগ (১৯৯০) বা মোট মাংসের এক-তৃতীয়াংশই (৩৫ শতাংশ) আসে ছাগল থেকে। ছাগল মাংস উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান, চিন, পাকিস্তান, ব্রাজিলের পর। ছাগল দুধ উৎপাদনে দ্বিতীয়, প্রথম চিন। দেখা গেছে, সমতলভূমিতে ছাগল পালনে আয় বেশি পাহাড়ি অঞ্চলের থেকে। ছাগলের দুধ থেকে সবচেয়ে বেশি আয় হয় (৬৬.৬-৮৪.৪ শতাংশ)। তারপর মাংস (ছাগল) বিক্রি (১৩.৪-৩০.৩ শতাংশ)। তারপর ছাগলের মল (১.০-৩.৪ শতাংশ)। ছাগল ১০০ শতাংশ অধিক লাভজনক গরুর থেকে এবং ১২৩ শতাংশ অধিক ভেড়ার থেকে।

✶ স্বল্প মূলধন ও জায়গা থাকলে সহজেই চাষ করা যায়। এতে ঝুকি কম, অথচ লাভ বেশি। আকৃতিগত দিক থেকে ছোট ও শান্ত স্বভাবের জন্য বাড়ির ছেলে, বুড়ো মহিলারাও ছাগল পালনে অংশগ্রহণ করতে পারে। সেইজন্য পরিবারের শ্রমের পূর্ণ ব্যবহার করা যায়। উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সাবধানতা অবলম্বন করলে ছাগলের রোগজ্বালাও কম হবে। বিশেষ করে গরিব ও ভূমিহীনদের ক্ষেত্রে ছাগল পালন অত্যন্ত লাভজনক। প্রাণী পালনে শতকরা ৭০ ভাগ খরচ হয় খাবারের দিক থেকে। আর ছাগল সেই সম্পূর্ণ ভাগ মাঠে চরে সংগ্রহ করে। তাই ছাগলকে গরিব মানুষের গরু বলে। একটি গরু বা মহিষ পালনের খরচায় পাঁচটি ছাগল অনায়াসে পালন করা যায়।

✶ দুধ উৎপাদনের জন্যও ছাগল চাষ করা হয়ে থাকে। যমুনাপারী, বারবারী প্রভৃতি ছাগল থেকে দুধ পাওয়া যায়। ভারতে উৎপাদিত মোট দুধের শতকরা ৩ ভাগ পাওয়া যায় ছাগল থেকে। ছাগলের দুধ সহজপাচ্য। শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষে খুব উপকারী। অনেক সময় গরুর দুধে শিশুদের অ্যালার্জি হয়ে থাকে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে ছাগলের দুধে অ্যালার্জির ভাগ কম। এছাড়াও ছাগলের দুধে শিশুদের পায়খানা পরিষ্কার (Laxative) করতে সাহায্য করে।

✶ ছাগলের চামড়া চর্মশিল্পের প্রধান কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর থেকে নানা ধরনের দ্রব্য তৈরি হয়। যেমন ঃ জুতো, ব্যাগ, দস্তানা, জ্যাকেট, বই বাঁধানোর সরঞ্জাম। বাংলার কালো ছাগলের চামড়া

পৃথিবী বিখ্যাত। পশ্চিমবাংলা থেকে সবচেয়ে সূক্ষ্ম (Finest) চামড়া পাওয়া যায়। এই চামড়া রপ্তানি করা হয় আমেরিকাতে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জুতোর কারখানাতে ব্যবহার হয়। ভারতে দু'ধরনের চামড়া পাওয়া যায়। অমৃতসর (Amritsar) ও (Kolkata)। প্রথমটি ব্যবহার হয় জুতোর নীচ (Sole) তৈরী করতে এবং দ্বিতীয়টি ব্যবহার হয় জুতোর ওপরের অংশে, যেটা জুতোর সৌখিন বিভিন্ন ডিজাইন (Design) ও ফ্যাসানে (Fashion) সাহায্য করে।

✶ ছাগলের লোম বা চুল দড়ি, ব্যাগ, পোশাক, টুপি, বিছানার ও ঘরের নানান উপকরণ ও অন্যশিল্পে ব্যবহৃত হয়। অ্যাংগোরা ছাগল থেকে প্রাপ্ত মোহেয়ার (Mohair) এবং চেগু ও চ্যাংথাঙ্গী ছাগল থেকে প্রাপ্ত পশমিনা থেকে উৎপন্ন শীতবস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করা হয়। কাশ্মীরি কার্পেট, শাল তৈরিতে ছাগলের পশমিনা বা লোম মহামূল্যবান দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

✶ ছাগলের মল মার্টির উর্বরতা বাড়াতে ব্যবহার করা হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ও ফসফরিক অ্যাসিড থাকে যা গরু বা মহিষের মলের চেয়ে অনেক বেশি যা মাটির চাষের পক্ষে উপযুক্ত। ছাগলের মূত্রে প্রায় একই রকম নাইট্রোজেন ও পটাশ থাকে যা কোন প্রাণীর চেয়ে মূল্যবান। একটি ছাগল বছরে প্রায় ১৩০ কেজি মলত্যাগ করে, এতে রেসিডুয়াল ইফেক্ট (Residual Effect) থাকে যা মাটির pH কমাতে সাহায্য করে।

✶ বর্তমানে ছাগল পালন অত্যন্ত লাভজনক পদ্ধতি। এতে অল্প সময়ের মধ্যে আয় উঠে আসে। দু'চারটা ছাগল পালন করে পরিবারের আয় যেমন বাড়ানো সম্ভব তেমনি বড় আকারের খামার স্থাপন করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ছাগল পালন করা যেতে পারে। আকৃতির দিক থেকে ছাগল ছোট হওয়ার জন্য খুব কম জায়গা লাগে। এদের মুক্তাঙ্গন (Free range) পদ্ধতিতে পালন করা যায়। এতে ছাগল সারাদিন চরে খায়, ফলে খাবারের খরচ প্রায় লাগে না বললেই চলে। খাবারের কোন বাছবিচার থাকে না। কথায় বলে 'ছাগলে কিনা খায়'। মাঠের ঘাস, লতা-পাতা, শাক্-সব্জি, রান্নাঘরের আনাজের খোসা প্রভৃতি খেতে পারে। তবে প্রকৃত লাভের জন্য বিজ্ঞানসম্মত চাষ করা, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়েৰ উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

● ছাগলের বিভিন্ন প্রজাতি ও প্রজনন ঃ

ছাগল ভারতবর্ষের একটি অর্থকরী প্রাণী, যারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জলবায়ুতে বসবাস করতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিভিন্ন জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে প্রাণীটির নানান প্রজাতির জন্ম হয়েছে। পৃথিবীতে প্রায় ১০২টি জাতের ছাগল আছে। ভারতে প্রায় ২০টি স্বীকৃত (Recognised breed) প্রজাতির ছাগল আছে। পৃথিবীর মোট ছাগল সংখ্যার ১৫-১৬ শতাংশ ভারতেই আছে। যার সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি (১৯৯৩)। এদের ৭৫ শতাংশ ছাগলের নির্দিষ্ট কোনো জাতে ফেলা যায় না। এদের এককথায় নন ডেসক্রিপ্ট বলে। বাকি ২৫ শতাংশ ছাগল ঐ ২০ প্রজাতির মধ্যে পড়ে। যদিও তাদের অধিকাংশেরই কোন নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নেই।

ছাগল সাধারণত মাংস, দুধ, চামড়া ও লোম সরাসরি উৎপন্ন করতে পারে। আবার বিভিন্ন প্রজাতির ছাগলে বিভিন্ন জলবায়ু ও উচ্চতার তারতম্য দেখা যায়। কোন ছাগল বিশাল বড় প্রায় ৫০-৬০ কেজি আবার কোন ছাগল ৮-১০ কেজি। তাই ছাগলের প্রজাতিকে সুবিধার জন্য বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দৈহিক ওজন অনুসারে ছাগলের জাতকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—**বড় আকৃতির, মাঝারি আকৃতির ও ছোট আকৃতির।**

- ✶ বড় আকৃতির—যমুনাপুরী, বিটল।
- ✶ মাঝারি আকৃতির—মারওয়ারী, সুর্তী, গাড্ডী, ওসমানাবাদী, চেগু।
- ✶ ছোট আকৃতির—ব্ল্যাক বেঙ্গল, আসাম টাইপ।

তাছাড়া বিদেশী উন্নত জাতের কিছু সেরা ছাগল আছে যাদের দৈহিক ওজন ও দুধ দেওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি। সত্তর ও আশির দশকে বেশ কয়েকটি বিদেশি জাতের ছাগল এনে নানান গবেষণা চালানো হয়। যাতে দেশি ছাগলের ওজন বাড়ে বা দুধ বেশি দেয় বা ভালো উন্নত পশম উৎপন্ন করে।বিদেশে বিখ্যাত কয়েকটি ছাগল হল ঃ **১। অ্যালপাইন, ২। সানেন, ৩। নুবিয়ান, ৪। টোগেনবার্গ** ইত্যাদি।

অঞ্চল	রাজ্যসমূহ	তাপমাত্রা উচ্চ-নিম্ন বৃষ্টিপাত	রাজ্যসমূহ	সংখ্যা
পশ্চিম হিমালয়	জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাবের উত্তরাংশে, উত্তর প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চল।	৪০-৩ (২৫০-২৮০)	চেগু, গাড্ডী, কঙ্কন, চাৎথাঙ্গী, হিমালয়ের সাদা ছাগল।	৬০ লক্ষ
পূর্ব হিমালয়	সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, আসাম, বাংলার উত্তরাঞ্চল।	৩৮-২ (১০০০-৩৩০০)	বাংলার কালো ছাগল, গ্রে, আসাম টাইপ।	৫০ লক্ষ
গাঙ্গেয় উপত্যকা	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান।	৪৯-২ (৬০০-২০০০)	বাংলার কালো ছাগল, যমুনাপারী, বিটল, বারবারী।	৪৫০ লক্ষ
পূর্বাঞ্চল	দঃ বিহার, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ।	৪৫-২ (৯৬০-১৭০০)	গঞ্জাম, বারবারী।	১২০ লক্ষ
মধ্যাঞ্চল	মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ।	৪৫-১ (৫৩০-১৫০০)	সিরহী, ঝারখানা।	১১০ লক্ষ
পশ্চিমাঞ্চল	মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমঘাট।	৪১-৫ (৬০০-২৫০০)	ওসমানবাদী, সংগমনেরী।	১২০ লক্ষ
দক্ষিণাঞ্চল	অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু।	৪২-১০ (৪৫০-১৩০০)	কান্নাইযরু মালাবারী।	১৪০ লক্ষ
শুষ্ক পশ্চিম	রাজস্থান, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র।	৪৭-১০ (১০০-৩০০)	মারওয়ারী।	৭০ লক্ষ
পূর্ব সমতল উপকূল	অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরী।	৩৯-১১ (৭০০-১৬০০)	বাংলার কালো ছাগল, আন্দামানী, দেশী।	১০০ লক্ষ

কয়েকটি সেরা জাতের ছাগলের বিবরণ ঃ ভারতের কয়েকটি উন্নত জাতের ছাগলের মধ্যে বাংলার কালো ছাগল অন্যতম। এছাড়াও যমুনাপারী, বারবারী, বিটাল, গাড্ডী ইত্যাদি ছাগলের কদরও কম নয়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট (বাংলার কালো ছাগল) ঃ মাংস ও চামড়ার জন্য বাংলার কালো ছাগল সত্যিই পৃথিবী বিখ্যাত। এদের মাংস সুস্বাদু, যা অন্য কোন ছাগলে পাওয়া যায় না। আর পৃথিবী বিখ্যাত 'মরোক্কো' চামড়া এই জাতের ছাগল থেকেই পাওয়া যায়। আর একটি গুণ বছরে এরা দুবার বাচ্চা দেয়। প্রতি বিয়ানে প্রায় ২-৩টি করে বাচ্চা প্রসব করে।

পূর্ব ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে এই প্রকার ছাগল পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের কিছু অংশ জুড়ে এই প্রকার ছাগল রয়েছে। এদের বাংলা দেশেও পাওয়া যায়। এই অঞ্চলগুলিতে এইপ্রকার ছাগলই বসবাসের উপযুক্ত।

রঙের ভিত্তিতে এই প্রকার ছাগলকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—কালো, বাদামী ও সাদা, এছাড়াও মিশ্র প্রকারের ছাগল দেখা যায়। এদের মধ্যে কালো ছাগল সর্বাধিক।

● বিশেষ গুণাবলী ঃ

- ✶ জন্মের সময় এদের ওজন ১-১.৫ কেজি। সাধারণত বিয়ানে অধিক বাচ্চা হলে ওজন কমে যায়।
- ✶ প্রথম বিয়ানে সাধারণত ১টি বা ২টি, পরবর্তী বিয়ানে ২-৩টি এমনকি ৪টি পর্যন্ত বাচ্চা হয়েছে।
- ✶ সাধারণত ৬-৭ মাস অন্তর বাচ্চা দিয়ে থাকে।
- ✶ স্ত্রী ছাগলটিকে ১৫-১৬ মাস বয়সে প্রথম প্রজনন করা যেতে পারে। অনেক সময় ১২-১৩ মাসেও প্রজনন করানো সম্ভব।
- ✶ বাচ্চা হতে সময় লাগে ১৪৫-১৫০ দিন, বাচ্চা হওয়ার দেড়মাস পরে আবার গর্ভধারণ করতে পারে
- ✶ ছাগল ১৮ দিন অন্তর গরম (Heat) হয় এবং গরম হওয়ার ১০-১২ ঘণ্টা পরে প্রজনন করতে হবে।
- ✶ ৮-১০ বার বিয়ানই যথেষ্ট। তারপর ঐ সকল ধাড়ীগুলিকে প্রজনন না করানোই ভাল। আর পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬-৭ বছর পর্যন্ত প্রজনন করাই ঠিক।
- ✶ এই জাতের ছাগল আকারে ছোট, বুক চওড়া, কান ছোট ও খাড়া, পেট ঝোলা টাইপের, গায়ের লোম ছোট ও নরম হয়। বছরের শেষে এরা প্রায় ১০-১২ কেজি হয়। ৬-১২ মাস বয়সের ছাগলের মাংসের স্বাদ সবথেকে ভাল। প্রাপ্তবয়স্ক ছাগলের গড় ওজন—স্ত্রী ছাগল ২০ কেজি এবং পুরুষ ছাগল ৩২ কেজি।
- ✶ এই প্রকার ছাগল কেবল মাংসের জন্য পালন করা হয়ে থাকে, এরা খুব কম দুধ দেয়, দৈনিক ৪০০-৫০০ গ্রাম। মাঠে ছেড়ে পালনের ক্ষেত্রে এই জাতের ছাগল খুবই উপযোগী। এরা খুব কষ্টসহিষ্ণু।

বাংলার কৃষ্ণকায় ছাগলের আকার অনেক ছোট হওয়ার জন্য অনেকেই বড় আকারের ছাগলের সংকরায়ণ ঘটাতে চায়। এই সংকরায়ণের ফলে বাচ্চার আকার কিছুটা বাড়ে, কিন্তু প্রতি বিয়ানে একাধিক বাচ্চা হওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং মাংস ও চামড়ার গুণগত মান অনেক কমে যাবে। সংকরায়ণের ফলে এক মিশ্র প্রজাতি তৈরি হলে লাভের তুলনায় ক্ষতিই বেশি হবে। ফলে প্রকৃত বাংলার কৃষ্ণকায় ছাগলের মাংসের গুণগত মান পাওয়া যাবে না। তাই বাংলার কৃষ্ণকায় ছাগলের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সংকরায়ণ না ঘটিয়ে সম জাতের মধ্যে প্রজনন ঘটানোই ভাল। তবে প্রজননের জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট পাঁঠাকে বার বার ব্যবহার না করে যদি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাঁঠা ব্যবহার করা হয় তাহলে একই জাতের মধ্যে প্রজননের যে কুপ্রভাব হওয়ার আশঙ্কা তা দূরীভূত হবে। সবসময় ভাল স্ত্রী ছাগলের সঙ্গে ভাল বলিষ্ঠ পাঁঠার প্রজনন করানো উচিত।

✶ **যমুনাপুরী ঃ** এই জাতের ছাগল উত্তরপ্রদেশের যমুনা, গঙ্গা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী এটোয়া জেলায় এবং আগ্রা ও মথুরা জেলায় দেখা যায়। এই ছাগলের আকার-আকৃতি বেশ বড় ধরনের। এরা মাংস ও দুধ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। সংকরায়ণের কাজে অন্যান্য দেশি জাতের সহিত এদের মিলন এবং এই কাজে প্রতিবেশী দেশেও এই ছাগল রপ্তানি করা হয়।

এরা সাদা ও হালকা হলুদ রঙের হয়, কখনও বাদামী বা কালো রঙের ছোপ দেহের যে কোন স্থানে দেখা যায়। রোমান নাকের মতো এদের টিকালো নাক ও কান দুটো লম্বা ও ঝোলানো, ভাঁজ করা। লম্বা পা যুক্ত ও পিছনের পায়ে লম্বা চুল থাকে। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগল ওজনে ৫০-৬০ কেজি ও স্ত্রী ছাগল ৪০-৫০ কেজি হয়। এরা ২০০ দিন ব্যাপী প্রতিদিন প্রায় ১.৫ কেজি থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত দুধ দেয়। ঐ দুধে ৪-৫ ভাগ ফ্যাচট থাকে। এরা বছরে একবার বাচ্চা দেয় এবং ১টিই বাচ্চা দেয়।

✶ **বারবারি ঃ** এদের আদি উৎপত্তিস্থল পূর্ব আফ্রিকার বারবেরা শহরে। ভারতে উত্তর প্রদেশের এটোয়া, আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। মাঝারি আকৃতির এই ছাগলগুলির রং সাদা ও হরিণের মতো দেহে ছোপ ছোপ দাগ থাকে। পাগুলি ছোট প্রকৃতির। পরিপূর্ণ পুং ছাগলের ওজন ২৫-৩০ কেজি ও স্ত্রী ছাগলের ওজন ৩৫-৪০ কেজি। ১২ থেকে ১৫ মাসের মধ্যে এরা দুবার বাচ্চা দিতে পারে এবং একসাথে দুটি বাচ্চা দেয়। দিনে সাধারণত ৮০০ গ্রাম থেকে ১.৫ কেজি দুধ দেয়। দুধে ফ্যাটের পরিমাণ প্রায় ৫ ভাগ।

✶ **বিট্টল ঃ** এই জাতের ছাগল পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় দেখা যায়। দেখতে অনেকটা যমুনাপুরী ছাগলের মতো নাকের ও মুখেৰ গঠন এক, তবে কান এতো বড় ও ঝোলানো নয়। এরা কালো, সাদা, লালচে বাদামী ও এদের মিশ্রণে হতে পারে। পূর্ণ বয়স্ক পুং ছাগলের ওজন ৫০-৬০ কেজি ও স্ত্রী ছাগলের ওজন ৪০-৫০ কেজি হয়। এরা সাধারণত এক সাথে একটি বাচ্চা দেয় তবে অনেক সময় দুটি বাচ্চা দেয়। দিনে প্রায় ১.৫-২ কেজি দুধ দেয়।

- **পশমিনা ও চাঙ্গথাঙ্গি ঃ** কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশের লাডাক, লাহুল ও স্পিটি উপত্যকায় প্রায় ৪০০০ মিটার উঁচু জায়গায় এই জাতের ছাগল দেখা যায়। দশ থেকে বারো ইঞ্চি লম্বা সুন্দর সিল্কের মতো লম্বা চুলে ঢাকা থাকে এদের সারা দেহ। চুলের মত লম্বা যে পশম থাকে তাকে পশমিনা বলে। এই পশমিনা দিয়েই তৈরি বিখ্যাত কাশ্মীরী শাল, কম্বল, সোয়েটার ও কার্পেট ইত্যাদি। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ২০ কেজি ও স্ত্রী ছাগলের ওজন ১৫-১৮ কেজি হয়। পাশমিনা ছাড়াও এর মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয়। দুধ দেয় খুব কম পরিমাণে।
- **সুরতি ঃ** গুজরাটের সুরাট ও বরোদায় এই ছাগল দেখতে পাওয়া যায়। দুধ উৎপাদনের জন্য এই ছাগল খুব উল্লেখযোগ্য। এই ছাগল স্টল ফিডিং (Stall feeding)-এর সাহায্যে ভালভাবে পালন করা যায়। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগল প্রায় ৩২ কেজি এবং পুরুষ ছাগল ৩০ কেজি। এরা মাঝামাঝি আকারের। এদের গায়ের রঙ সাদা হয়। কান মাঝামাঝি আকারের। এই ছাগলের পালান অপেক্ষাকৃত অনেক বড়, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ছাগলের ক্ষেত্রে শিং আছে, তা ওপরের দিকে সামান্য বেঁকানো। দিনে প্রায় ২ কেজি দুধ দেয়। সানেনের সঙ্গে সংকরায়ণ করার জন্য দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে।
- **ওসমানাবাদী ঃ** মহারাষ্ট্রের ওসমানাবাদ এই জাতের ছাগলের আদি নিবাস। তবে অন্ধ্রপ্রদেশেও এই ছাগল দেখতে পাওয়া যায়। এরা দীর্ঘদেহী, গায়ের রং সাধারণত কালো হয়, তবে কখনও কখনও বাদামী বা সাদা ছোপ ছোপ দাগ থাকে। পুরুষ ছাগলের শিং থাকে, স্ত্রী ছাগলের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশই শিং থাকে না। প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগলের গড় ওজন—স্ত্রী ছাগল ৩০ কেজি এবং পুরুষ ছাগল ৩৫ কেজি। এদের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা কম। সাধারণত মাংসের জন্য এই ছাগল পালন করা হয়। এরা বছরে ২ বার আবার ২ বছরে ৩ বার বাচ্চা দেয়। প্রতি বিয়ানে সাধারণত ২টি বাচ্চা দেয়।
- **বাখরানা ঃ** এই জাতের ছাগলের আদি নিবাস রাজস্থান। রাজস্থানের আলওয়াল জেলার বাখরানা অঞ্চলের নামানুসারে এই জাতের ছাগলের নামকরণ করা হয়েছে।

  এদের গায়ের রঙ সাধারণত কালো, তবে কান ও মাজেলে সাদা ছোপ ছোপ দাগ থাকে। এদের কান চ্যাপ্টা ও মাঝারি, কপাল উঁচু হয়। স্ত্রী ছাগলের পালান উন্নত ধরনের। এরা আকারে বড় হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগলের গড় ওজন—স্ত্রী ছাগল ৪৫ কেজি এবং পুরুষ ছাগল ৫৫ কেজি। সাধারণত দুধ উৎপাদনের জন্য এই ছাগল পালন করা হয়। তবে মাংস ও চামড়ার চাহিদা যথেষ্ট ভালো। স্ত্রী ছাগল দিনে গড়ে ১ কেজি দুধ দেয়। প্রতি বিয়ানে ১-২ বাচ্চা দেয়। আবার কখনও কখনও ৩টিও বাচ্চা দেয়।
- **মারোয়ারী ঃ** রাজস্থানের মারোয়ার অঞ্চল এই জাতের ছাগলের আদি বাসস্থান। তবে গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের গায়ের রং কালো, তবে কানের কাছে সাদা দাগ থাকে। দেহের লোম লম্বা, প্রায় ১০-১২ সেমি, শিং লম্বা, স্ক্রুর মতো বাঁকানো। দেহের আকার মাঝারি। প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগলের গড় ওজন—পুরুষ ছাগল ৩৫ কেজি ও স্ত্রী ছাগল ২৫ কেজি। এই

ছাগল ত্রিবিধ উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করা হয়, অর্থাৎ মাংস, দুধ ও লোম। এদের মাংস সুস্বাদু, এরা দৈনিক—০.৭৮-১ কেজি দুধ দেয়। একটি ছাগল থেকে বছরে গড়ে ৩০০ গ্রাম লোম পাওয়া যায়।

★ **চেন্ড ঃ** হিমাচল প্রদেশের লাহুল এবং স্পিরিট উপত্যকা, উত্তরকাশী, চামলি, উত্তর প্রদেশের পিথোরাগড় জেলায় এই প্রকার ছাগল পাওয়া যায়। মাঝারি আকারের ছাগল, গায়ের রং সাধারণত সাদা, তবে ধূসর রঙেরও পাওয়া যায়। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ছাগলের ক্ষেত্রে শিং বর্তমান এবং শিং উপরের দিকে তোলা, বাঁকানো। প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগলের গড় ওজন পুরুষ ছাগল ৩৬ কেজি, স্ত্রী ছাগল ২৫ কেজি। এই প্রকার ছাগল পশমিনার জন্য বিখ্যাত। বছরে প্রতিটি ছাগল গড়ে ১২০ গ্রাম পশমিনা উৎপন্ন করে।

এছাড়াও কিছু ছাগল আছে যাদের যে অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় সেই অঞ্চলের নামানুসারে নামকরণ করা হয়। যেমনঃ কেরালার বালাহারি (Balahari), তামিলনাড়ুর কান্নাইঅড়ু (Kannaiodu), জম্মু ও কাশ্মীরের বাখারওয়াল (Bakharwal) ইত্যাদি। ভারতে ২০ প্রকার স্বীকৃত জাতি ছাড়াও আরো কিছু নাম না জানা ছাগল আছে যাদের কোন জাতে ফেলা যায় না। এদের মাংস ও চামড়ার গুণগত মান অনেক কম। দুধের উৎপাদনও কম। শুধউ মাংসের জন্য পালন করা হয়। দাক্ষিণাত্যের সমভূমি অঞ্চলে এইপ্রকার ছাগল দেখতে পাওয়া যায়। কোন স্বীকৃত জাতির ছাগলের সঙ্গে সংকরায়ণ ঘটিয়ে এদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো যেতে পারে।

● দেশি কোন্ জাতের ছাগলে কি উৎপাদন ঃ

★ **দুধ ও মাংস ঃ** যমুনাপুরী, বারবারি, বিট্‌ল, সুর্তি, ঝাক্‌রানা।

★ **শুধুমাত্র মাংস ঃ** ব্ল্যাক বেঙ্গল, গঞ্জন, মালাবাড়ী, কানাই আবু, ওস্‌মানাবাদ, সঙ্গমেরী, কুচি, জালাওয়ারী, গোহিলয়ারী, মেস্‌না, সিরহী।

★ **পশম ঃ** চাঙ্গথাঙ্গি, চেগু, গাড্ডী, মারওয়ারী।

● বিদেশী ছাগলের বিবরণ ঃ

★ **অ্যালপাইন ঃ** ইউরোপে, প্রধানত ফ্রান্সে এই ছাগলের দেখা পাওয়া যায়। গরমেরি দেশেও এই ছাগল টিকতে পারে। প্রধানত দুধেৰ জন্য ব্যবহার করা হয়। গড়ে দৈনিক ৯০০ গ্রাম থেকে ১.৩ কেজি দুধ দেয় এবং দুধে ফ্যাট শতকরা ৩.৬ ভাগ। এদের ওজন ৬০-৬৫ কেজি হয়। প্রতিবারে ২টি করে বাচ্চা দিতে পারে।

★ **নুবিয়ান ঃ** বিদেশে ভারতের যমুনাপুরী ছাগলের সহিত ইংল্যান্ডের ছাগলের মিলনে এই নুবিয়ান জাতের ছাগল তৈরি হয়েছে। সুদানে এদের জন্মস্থান। দুধ ও মাংস উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এদের ওজন প্রায় ৬০-৭০ কেজি এবং দুধের পরিমাণ দৈনিক প্রায় ৮০০ গ্রাম থেকে ১.২ কেজি, ফ্যাটের পরিমাণ ৪.৫ ভাগ। একসাথে দুটি বাচ্চা দেয়।

✶ **সানেন ঃ** সুইজারল্যান্ডের ছাগল। পৃথিবীতে দুধেৰ রাণী বলে খ্যাত। এরা গড়ে ২-৩ লিটার দুধ দেয় প্রতিদিন এবং দুধে ফ্যাটের পরিমাণই ৩.৫ ভাগ। এদের ওজন ৬৫-৭০ কেজি হয়।

● কোন জাতের ছাগল পালন করবেন?

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মাংসের জন্য ছাগল পালন করতে হলে বাংলার কৃষ্ণকায় জাতের 'ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট' বেশ ভাল। বাজারে এই মাংসের চাহিদা, দাম ও কদর সবচেয়ে বেশি যা অন্য কোন দেশি বা বিদেশি জাতের ছাগলে নেই। তাছাড়া সারা পৃথিবীতে এই জাতের ছাগলের যথেষ্ট সুনাম আছে। তবে এরা দুধ কম দেয়। দুধ ও মাংসের জন্য ছাগল পালন করতে হলে যমুনাপুরী জাতটি ভাল। তবে এদের মাংসের স্বাদ বেঙ্গল জাতের ছাগলের মতো ভালো নয় বলে মাংসের দাম কম। তাছাড়া চামড়ার মানও তেমন ভালো নয়। তবে অনেকে ঐ দুটি জাতের মিলনে সংকর ছাগলও পালন করছেন। তাতে দুধ ও মাংসের পরিমাণ বাড়ে কিন্তু ফল আশানুরূপ হয় না। বিজ্ঞান সম্মতভাবে উন্নত মানের বাংলার কালো জাতের ছাগল চয়ন ও প্রতিপালন করতে পারলে বাংলার মাটিতে ঐ ছাগল পালন অধিক লাভজনক হতে পারে।

বাংলার কৃষ্ণকায় ছাগলের আকার অনেক ছোট হওয়ার জন্য অনেকেই বড় আকারের ছাগলের সংকরায়ন ঘটাতে পারে। এই সংকরায়ণের ফলে বাচ্চার আকার কিছুটা বাড়ে, কিন্তু প্রতি বিয়ানে একাধিক বাচ্চা হওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং মাংস ও চামড়ার গুণগত মান অনেক কমে যায়। সংকরায়ণের ফলে একটি মিশ্র প্রজাতি তৈরি হলে লাভের তুলনায় ক্ষতিই বেশি হবে। ফলে প্রকৃত বাংলার কৃষ্ণকায় ছাগলের মাংসের গুণগত মান পাওয়া যাবে না। তাই বাংলার কৃষ্ণকায় ছাগলের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সংকরায়ণ না ঘইটয়ে সম জাতের মধ্যে প্রজনন ঘটানোই ভাল। তবে প্রজননের জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট পাঁঠাকে বার বার ব্যবহার না করে যদি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাঁঠা ব্যবহার করা হয় তাহলে একই জাতের মধ্যে প্রজননের যে কুপ্রভাব হওযার আশঙ্কা থাকে তা দূরীভূত হবে। সবসময় ভাল স্ত্রী ছাগলের সঙ্গে ভাল বলিষ্ঠ পাঁঠার প্রজনন করানো উচিত।

প্রতি বছর পাঁঠা পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়।

● ছাগলের প্রজনন ঃ

ছাগল পালনের প্রথমে উন্নত জাত ঠিক করার পর ঐ জাতের উন্নত মানের ছাগল চয়ন বিশেষ প্রয়োজন। সঠিক সময়ে সুস্থ সবল ছাগলের প্রজনন ঘটিয়ে তাদের বংশবৃদ্ধি ও উৎপাদন করানো দরকার।

● প্রজননের প্রথম দিক ঃ

ছাগল কালো ছাগল একসাথে ২-৩টি বাচ্চা দেয়। ১০টি স্ত্রী ছাগল ২০-৩০টি বাচ্চা দিতে পারে এক একটি বিয়ানে। এর অর্ধেক স্ত্রী ও অর্ধেক পুরুষ ছাগল। পুরুষ ছাগলকে মাংসের জন্য বড় করতে হবে। আর স্ত্রী ছাগলগুলিকে ছোটবেলায় বেঁচে দিয়ে তার থেকে সুস্থ, সবল, ভাল চেহারার কয়েকটি ছাগল

প্রজননের জন্য রেখে দিতে হয়। তবে স্ত্রী ও পুরুষ ছাগলের বয়স তিন বছর হওয়ার আগেই প্রজননের ছাগল বাছাই করলে ভাল হয়।

● স্ত্রী ছাগল বাছাই ঃ

দুধ উৎপাদন ও অধিক বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করে ছাগলের বংশগত বৈশিষ্ট্যের ওপর। তাই ছাগল পালনের উদ্দেশ্য নির্ভর করে শুধু মাংসের জন্য, শুধু দুধের জন্য এবং দুধ ও মাংস দুটির জন্য। এর জন্য প্রথমেই ছাগলের জাত নির্বাচন করতে হবে। আবার একই জাতের ছাগলের বিভিন্ন দৈহিক আকৃতির জন্য তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বিভিন্ন হয়, তাই ছাগল বাছাইয়ের জন্য আকৃতিও স্মরণে রাখতে হবে। এছাড়া সঠিক সময়ে গরম হবে। প্রতি দুই বছরে তিন বার বাচ্চা দেবে। ১৬ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে প্রথম বাচ্চা দেবে। গড়ে কমপক্ষে ৩০০ কেজি দুধ দেবে ২০০-২৫০ দিন সময়ব্যাপী। খাদ্যকে উৎপাদনে পরিণত করার ক্ষমতা যেন বেশি থাকে। এদের শরীর সুস্থ ও নীরোগ হবে।

● ভাল স্ত্রী ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ✶ **মাথা ঃ** লম্বা এবং অপেক্ষাকৃত সরু, সজীবতা থাকবে।
- ✶ **গলা ঃ** লম্বা ও সরু, আলগা চামড়া থাকবে। গলা ও কাঁধ একই সরলরেখায় থাকবে।
- ✶ **কাঁধ ঃ** চওড়া, সোজা থাকবে এবং কাঁধের পেছনের দিকে পেশীবহুল মাংস থাকবে।
- ✶ **বুক ঃ** গভীর, পাঁজর বোঝা যাবে, পাঁজরের শেষের হাড় পেছনের দিকে বেঁকে থাকবে।
- ✶ গর্ত থাকবে, ঠিক হিপবোনের সম্মুখভাগে।
- ✶ **নিতম্ব ঃ** লম্বা, খুব ঢাল থাকার জন্য রক্তনালীকে রক্ষা করে।
- ✶ **পালান ঃ** পালান হবে বড় আকারের, তবে শরীরের সঙ্গে মানানসই বড় পালান অধিক দুধ উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে। পালানের লোবগুলি পশমের মত নরম হবে। ভরা পালান দুধ দেবার পর চুপসে যাবে।
- ✶ **হক সন্ধি ঃ** শক্ত-পোক্ত হবে এই সন্ধি।
- ✶ **বাঁট ঃ** বাঁট হবে হাতের সাইজের। দুটি বাঁটের মধ্যে বেশ ফাঁক থাকবে মোটা সাইজের। দুটি বাঁট আলাদা হবে এবং দুটোতেই দুধ থাকবে। পালানের সঙ্গে মানানসই বাঁট থাকবে। পালানের পাশে দুধ শিরা বেশ স্পষ্ট থাকবে।
- ✶ পেটের নীচে মিল্কভেন দেখা যাবে, যদি দেখা না যায়, সেক্ষেত্রে হাত দিয়ে অনুভব করতে হবে।
- ✶ **নী সন্ধি ঃ** শক্ত, সামনের পা হবে সোজা।
- ✶ **চোয়াল ঃ** লম্বা, শক্তিশালী, আহার বেশি হবে, নীচের চোয়ালে ৮টি দাঁত থাকবে।
- ✶ **দেহের আবরণ ঃ** চামড়া হবে নরম ও আলগা, দেহের লোম হবে চকচকে ও উজ্জ্বল, কোনরূপ ক্ষমতা থাকবে না।

● উৎপাদনে অক্ষম স্ত্রী ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ✶ **মাথা ঃ** মাথা অপেক্ষাকৃত ছোট, উত্তল মুখ, কম বা বেশি বাঁকানো নাক।
- ✶ **গলা ঃ** ছোট ও মোটা।
- ✶ **বুক ঃ** সরু, পাঁজরে হাড় সোজা।
- ✶ **পেট ঃ** ছোট।
- ✶ **পালান ও বাঁট ঃ** ছোট, শক্ত চামড়া, ছোট বাঁট এবং শক্ত।
- ✶ **নিতম্ব ঃ** ছোট এবং অপেক্ষাকৃত কম ঢালু থাকবে।

● প্রজনন করানোর সময় ঃ

১৫-১৮ মাস বয়স হলে তবেই স্ত্রী ছাগলকে প্রজননের কাজে ব্যবহার করা যায়। তবে ঠিখমত সুষম খাদ্য দিলে ও উন্নতভাবে প্রতিপালন করলে আরও ৩ থেকে ৫ মাস আগে ঐ ছাগলকে প্রজননে ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ এক বছর বয়সেই তাদের ঐ কাজে লাগানো যায়।

পুরুষ ছাগলকে ১৮-২৪ মাসের মধ্যে ঐ বীজ কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে খাদ্য ও পরিচর্যা ভাল হলে এবং স্বাস্থ, গড়ন ও আকার ভাল হলে ১৫ মাসের পর প্রজনন করানো যায়। এর আগে প্রজনন করালে বীর্যের মান ভাল হয় না, তরল ও পাতলা হয় এবং পরিমাণে কম হয়। তাই ভাল মানের বাচ্চা পাওয়া যায় না।

তবে ২-৩ মাসের পর এদের মধ্যে যৌন ইচ্ছা জাগে, ফলে উভয় লিঙ্গের ছাগলদের আলাদা করে রাখতে হয়। একটি পুরুষ ছাগলের ১ বছর বয়স হলে বছরে কয়েকটি স্ত্রী ছাগলের সহিত প্রজনন করানো যায়। কিন্তু দেড় থেকে ২ বছর বয়সের পর বছরে ২৫ থেকে ৩০টি ছাগলের সহিত এবং পূর্ণ বয়সে (আড়াই থেকে তিন বৎসর) প্রায় বছরে ৫০ থেকে ৬০টি ছাগলের সহিত প্রজনন করানো যায়।

পাঁঠার বেশি কামশক্তি বাড়ে শীত ও বসন্ত কালে। এই সময় এদের দেহ থেকে এক বিশেষ প্রকারের গন্ধ (Goat odour) বের হয় যা স্ত্রী ছাগলকে কাছে আসতে সাহায্য করে।

● কতদিন প্রজনন করানো যায় ঃ

৬বার বাচ্চা দেওয়ার পর আর প্রজননের কাজে স্ত্রী ছাগলকে ব্যবহার করা উচিত নয়। তাই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ক্ষেত্রে ৫ বৎসর বয়সের পর আর প্রজননে ব্যবহৃত হয় না। এই বয়স অবধি ছাগলের বাচ্চার মান ভাল থাকে। পুরুষ ছাগলের ক্ষেত্রে ৫-৬ বৎসর পর্যন্ত প্রজননে ব্যবহার করা যায়। সাধারণ অবস্থায় যদিও একটি ছাগল ১২ বৎসর বাঁচে। তবে উপযুক্ত খাদ্য, পরিচর্যা করলে পাঁঠাকে ৮-১০ বৎসর পর্যন্ত প্রজননের কাজে লাগানো যায়।

● বছরে কোন সময়ে প্রজনন করাবেন ঃ

ছাগলকে সারা বছরেই প্রজনন করানো যায়। এটা নির্ভর করে কতদিন ছাগলের দুধ নেওয়া হবে ও বাচ্চাকে মায়ের কাছ থেকে পৃথক করা হবে। যমুনাপুরী ও বিট্‌ল্‌ জাতের ছাগলের ক্ষেত্রে জুলাই মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রজননের উপযুক্ত সময়। পুরুষ ছাগলের ক্ষেত্রে শীত ও বসন্ত প্রজননের আদর্শ সময়।

● পুরুষ ছাগলের প্রজনন পদ্ধতি ঃ

দেড় থেকে ২ বছরের পর ছাগলকে নিয়ম মেনে প্রজনন করানো উচিত। একবারে একটির বেশি ছাগলকে প্রজননে ব্যবহার করা ভাল নয়। সপ্তাহে একবার প্রজনন করালে ভাল। বেশি প্রজনন করালে বীর্যের মান ও ঘনত্ব কমে যায় এবং ছাগলের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যেতে পারে। পুরুষালী ছাগল ও ভালো মানের বীর্যের দ্বারা প্রজনন করালে বাচ্চারা ভালো মানের হয়।

● স্ত্রী ছাগলের প্রজনন পদ্ধতি ঃ

প্রথমবার ১৫ থেকে ১৮ প্রজনন করানো হয় এবং দ্বিতীয় বার বাচ্চা দুধ ছাড়ার একমাস পরে পুনরায় প্রজনন করানো হয়। অর্থাৎ একবার বাচ্চা দেওয়ার তিন মাসের মাথায় পুনরায় প্রজনন করানো যায়। বাচ্চা দিতে এরা সময় নেয় ১৪৫-১৫২ দিন, গড়ে ৫ মাস। তাই একবার বাচ্চা দেওয়ার (৩ মাস + ৫ মাস) ৮ মাসের মাথায় আর একবার বাচ্চা পাওয়া যায়। এইভাবে প্রতিক্ষণে ১টি বা ২টি করে ছাগলকে প্রজনন করালে ৮ মাস পর ২টি বা ৪টি করে বাচ্চা পাওয়া যাবে।

স্ত্রী ছাগল ১৮-২১ দিন অন্তর গড়ে ১৯ দিন অন্তর গরম হয় এবং ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা গরম থাকে। তবে বিট্‌ল ছাগল গরম থাকে ১৮ ঘণ্টার মত। গরম শুরু হওয়ার ১০-১২ ঘণ্টা পরে প্রজনন করানো ভাল এবং প্রয়োজন হলে দ্বিতীয়বার প্রজনন করা যায় প্রথমবারের ১০ ঘণ্টা পরে। বেশি বাচ্চা পেতে ও বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হওয়ার জন্য এইভাবে প্রজনন করাতে হয়। তবে আগস্ট থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে প্রজনন করিয়ে ৫ মাস বাদে অর্থাৎ জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত যে বাচ্চা পাওয়া যায় তাদের বৃদ্ধির হার বেশি।

ছাগল ১৯ দিন পরপর গরম হয় এবং সেই গরম হওয়ার লক্ষণগুলি হল—অস্থিরতা প্রকাশ, অন্য ছাগলকে বিরক্ত করা, অন্য ছাগলের ঘাড়ে উঠবার চেষ্টা করা কিম্বা খামারের অন্য ছাগল গরম হওয়া ছাগলের উপর ওঠার চেষ্টা করে। দুপাশে লেজ নাড়া ঘন ঘন, হঠাৎ খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেওয়া। দুধেল ছাগলের দুধ হঠাৎ কমে যাওয়া, যোনিদ্বার লাল ও ফোলা ফোলা ভাব থাকে, যোনিদ্বার দিয়ে তেলের মত স্বচ্ছ পদার্থ বের হয়। ঘন ঘন প্রস্রাব হয়।

ছাগল গরম হওয়ার ১০-১২ ঘণ্টা পর প্রজনন করাতে হয়। এই প্রজনন স্বাভাবিকভাবে করা যায় আবার কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমেও করা যায়। তবে গরুর মত ছাগলের ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রজনন জনপ্রিয় নয়

সাধারণতঃ পুরুষ ছাগলকে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে স্ত্রী ছাগলের প্রজনন করানো হয়। এইভাবে ১৮-২১ দিনের মধ্যে স্ত্রী ছাগলের প্রজনন করানো হয়। এইভাবে ১৮-২১ দিনের মধ্যে স্ত্রী ছাগলের প্রজনন করানো হয়। এইভাবে ১৮-২১ দিনের মধ্যে স্ত্রী ছাগলটি যদি আর গরম না হয় তবে বুঝতে হবে ছাগলটি গর্ভবতী হয়েছে এবং ৫ মাস বাদে বাচ্চা প্রসব করবে। কিন্তু যদি পুনরায় গরম হয়, সেক্ষেত্রে অনেক সময় 'রিপিট ব্রিডিং' এর জন্য ছাগলটি গর্ভবতী হয় না। এই অবস্থায় প্রাণী চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে কিম্বা ১টি বা ২টি গরমকাল ছেড়ে দিয়ে অন্য পুরুষ ছাগল দিয়ে প্রজনন করালে বা প্রজনন অঙ্গের চিকিৎসা করালে বা পুষ্টিকর ভিটামিন 'এ' যুক্ত সুষম খাবার খেতে দিলে সুফল পাওয়া যায়।

ছাগলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে গর্ভবতী থাকা অবস্থায় মাঝে মাঝে গরম হয়। পাঁঠার সাথে পাল খাওয়ায় কিন্তু দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হয় না।

● ছাগলের প্রজননঘটিত বৈশিষ্ট্য ঃ

✶ পূর্ণতা প্রাপ্তির বয়স	৪-৮ মাস
✶ স্ত্রী ছাগলের প্রজননের সময়	১৫-১৮ মাস
✶ ঐ সময় স্ত্রী ছাগলের ওজন	১০-৩০ কেজি
✶ পুরুষ ছাগলের প্রজননের সময়	১৮-২৪ মাস
✶ প্রজননে পুরুষ ছাগল পিছু স্ত্রী ছাগলের সংখ্যা	১০ ঃ ৫০টি
✶ গরম হয় কতদিন অন্তর	১৮-২১ দিন
✶ গরম থাকার সময়	২৪-৪৮ ঘণ্টা
✶ গরম হওয়ার পর প্রজননের সময়	১০-১২ ঘণ্টা
✶ কতবার প্রজনন করানো দরকার	১ বার, কিছু ক্ষেত্রে ২ বার
✶ বাচ্চা হতে সময় লাগে	১৪৫-১৫২ দিন
✶ বাচ্চা হবার পর পুনরায় গরম হতে সময়	৩ দিন
✶ মায়ের কাছ থেকে বাচ্চা সরিয়ে নেওয়া হয়	২ মাস
✶ একসাথে বাচ্চা দেয়	২-৩টি
✶ খাসীকরণ করার বয়স	২ মাস
✶ মাংস বাজার করার সময়	৬-১২ মাস
✶ বাজারজাত করার সময় ছাগলের ওজন	৮-১২ কেজি
✶ জন্মের সময় ওজন	১-৩.৫ কেজি
✶ দৈনিক দুধ উৎপাদন	১-২ কেজি
✶ প্রজননের কাল বা সময়	আগস্ট-সেপ্টেম্বর (শ্রাবণ-কার্ত্তিক)

২

ভেড়া পালন

ভেড়া (Sheep) বা মেষ পালন মানব সভ্যতা শুরুর সময় থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতায় ভেড় পালনের নিদর্শন পাওয়া গেছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে ভেড়া পালন ছাগল পালনের মত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। ভেড়াকে মাংস ও পশমের (Wool) জন্য পালন করা হয়। রাজস্থান, গুজরাট, জম্বু ও কাশ্মীর, তামিলনাড়ু কর্নাটক রাজ্যে সব থেকে বেশী ভেড়া পালন করা হয়। বর্তমানে ভারত ভেড়ার সংখ্যায় (৪.৫ কোটি) পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

প্রাণীজগতে ভেড়ার অবস্থান (Sheep in Animal Kingdom)

পর্ব (Phylum)	→	মেরুদণ্ডী (chordata)
শ্রেণী (Class)	→	স্তন্যপায়ী (mammalia)
বর্গ (Order)	→	আরটিওডাকটাইলা (Artiodactyla)
পরিবার (Family)	→	বোভিডে (Bovidae)
গোত্র (Genus)	→	ওভিস (Ovis)
প্রজাতি (species)	→	এরিস (Aries)

বৈজ্ঞানিক নাম *Ovis aries*

❖ ভেড়া পালনের সুবিধা ঃ

- ✶ ছাগলের মত ভেড়া পালনের জন্য কোন নির্দিষ্ট রকমের ঘরের দরকার নেই।
- ✶ এদের জন্য আলাদা খাবার লাগে না যদি পর্যাপ্ত চষে বেড়ানোর জায়গা দেওয়া যায়।
- ✶ ভেড়া থেকে মাংস ছাড়াও পশম ও দুধ পাওয়া যায়।
- ✶ ভেড়ার পশম থেকে বিভিন্ন রকম শীতবস্ত্র, কার্পেট ও শৌখিন দ্রব্য তৈরী করে প্রচুর মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছে।

❖ ভেড়ার বিভিন্ন প্রজাতি ঃ

ভারতে ভেড়ার ৪৪টি প্রজাতি আছে যদিও এর বেশীর ভাগ দেশীয় (Non-descript)। ভেড়ার প্রজাতিগুলোকে বাসস্থান অনুযায়ী চারটি ভাগে ভাগ করা হয়।

১। নাতিশীতোষ্ণ উত্তরাঞ্চলের ভেড়া ঃ

গাড্ডী (Gaddi), রামপুর-বাসেহার (Rampur-Bushair), ভাকারওয়াল (Bhakarwal), গুরেজ (Gurez), কাশ্মীর মেরিনো (Kashmirmerino), চ্যাঙ্গথাঙ্গি (changthangi), পুঞ্চি (poonchi) ইত্যাদি। এই ভেড়ার প্রজাতিগুলি পশম উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এদের জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশে পাওয়া যায়।

২। শুষ্ক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভেড়া ঃ

চোকলা (chokla), নালি (Nali) মারওয়ারি (marwari), জয়সলমিরি (Jaisalmeri), পুঙ্গল (Pungal) সোনাদি (Sonadi), মালপুরা (malpura), মুজাফরনগরি (muzaffarnagri) মগরা (magra) ইত্যাদি। এই অঞ্চলে রাজস্থান, গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ পড়ে। উপরোক্ত প্রজাতিগুলি মাংস এবং পশমের জন্য পালন করা হয়।

৩। দক্ষিণাঞ্চলের ভেড়া ঃ

ডেকানি (Decani), নেল্লোর (Nellore), হাসান (Hassan), নীলগিরি (Nilgiri), মান্ডিয়া (Mandya), মাদ্রাজ রেড (Madras Red), মাচেরি (Macheri)। উপরোক্ত প্রজাতিগুলি অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ইত্যাদি রাজ্যে প্রধানত মাংসের জন্য পালন করা হয়।

৪। পূর্বাঞ্চলে ভেড়ার প্রজাতি ঃ

আর্দ্র পরিবেশ হওয়ার জন্য ভেড়া পালন এই অঞ্চলে ততটা লাভজনক নয়। উল্লেখযোগ্য ভেড়ার প্রজাতিগুলি হল ছোটনাগপুরি (chotanagpuri), সাহাবাদী (shahabadi), গুঙ্গাম (Gangam) বনপালা (Bonpala), তিব্বতী (Tibbati), গাড়োল, (Garole) বালা গিরি (Balangiri) ইত্যাদি।

এছাড়া ভারতে বিভিন্ন স্থানে প্রচুর বিদেশী প্রজাতির (Exotic) ভেড়া সংকরায়নের জন্য পালন করা হয়। যেমন মাংসের জন্য সাফোল্ক (suffolk), ডরসেট (Dorset), সাউথডাউন (Southdown)। পশমের জন্য মেরিনো (Merino), বারবুইলেট (Rambouillet), পোলওয়ার্থ (polworth)। দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে (মাংস ও পশম) করিডেল (corriedale) এবং পেল্ট (pelt)-এর জন্য কারাকুল (karakul) ইত্যাদি।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত তিনটি প্রজাতির ভেড়া পালন করা হয় যথা—সাহাবাদি ছোটনাগপুরি ও গাড়োল। তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হল।

❖ সাহাবাদি (Shahabadi) ঃ

● **উৎপত্তিস্থল** (Origin) ঃ সাহাবাদি ভেড়ার আদি বাসস্থান বিহারের পাটনা, গয়া, এবং সাহাবাদ জেলা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলাতেও সাহাবাদি ভেড়া পালন করা হচ্ছে, বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে।

● **প্রজাতি বৈশিষ্ট্য** (Breed characteristics) ঃ মাঝারি চেহারা, লম্বা পা ও লেজ, টিকালো রোমান নাক, কান মাঝারি মাপের ও ঝুলন্ত, গায়ের রং সাদা বা হালকা বাদামি মাঝে মাঝে কালো ছোপ থাকে। এদের শিং থাকে। পায়ে ও পেটে খুব ছোট ছোট পশম থাকে। পরিণত পুরুষ ভেড়ার ওজন গড়ে ২৫-৩০ কেজি এবং স্ত্রী ভেড়ার ২০-২৫ কেজি। এক এককটি ভেড়া থাকে বছরে ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি পশম পাওয়া যায়। এদের দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে পালন করা হয়।

❖ ছোটনাগপুরি (Chotonagpuri) ঃ

● **উৎপত্তিস্থল** (Origin) ঃ বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি। বর্তমানে বিহারের ছোটনাগপুর, রাঁচী, হাজারিবাগ,সিংভূম, ধানবাদ, সাঁওতাল পরগনাতে এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলাতে দেখা যায়।

● **প্রজাতি বৈশিষ্ট্য** (Breed characteristics) ঃ গায়ের রং হালকা বাদামী থেকে ধূসর। ছোট চেহারা, কান ও লেজ ছোট, শিং বর্তমান। পশম মোটা হয়। পরিণত বয়সে এদের গড় ওজন ১৫-২০ কেজি। এদেরও দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে পালন করা হয়।

❖ গাড়োল (Garole) ঃ

● **উৎপত্তিস্থল** (Origin) ঃ গাড়োল পশ্চিমবাংলার একমাত্র স্বীকৃত ভেড়ার প্রজাতি। প্রধানত উত্তর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় এদের পাওয়া যায় বা আরও সঠিকভাবে বললে সুন্দরবন এলাকায়।

● **প্রজাতি বৈশিষ্ট্য** (Breed characteristics) ঃ গাড়োল কথাটি অর্থ হল বোকা, এই নামকরণের কারণ এদের অত্যন্ত ভীতু স্বভাব, বোকা বোকা স্বভাব। ছোট দেহ অবয়ব, শিংযুক্ত, গায়ের রং বিভিন্ন রঙের হয়। সাদা বাদামী, ধূসর, কালো বা উপরোক্ত দুটি রঙের সংমিশ্রণ। গায়ের পশম খুব মোটা, যার বাজার মূল্য নেই বললেই চলে। লেজ খুব ছোট। এদের কান খুব ছোট। গাড়োল একমাত্র ভেড়ার প্রজাতি খরা জলে বা কর্দমাক্ত জমিতে ঘুরে বেড়ায়। এরা প্রতি বিয়ানে গড়ে প্রায় দুটি করে বাচ্চা দেয়। এদের প্রধানত মাংসের জন্য পোষা হয়।

❖ গাড়োল ভেড়া ঃ বিকল্প আয়ের উৎস

সুন্দরবন শব্দটি উচ্চারিত হলেই মাথায় আসে বাদার জঙ্গল, লোনা, খাঁড়ি, জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ। প্রকৃতি যেন প্রতিকূল আবহাওয়ার সব পসরা সাজিয়ে বসে আছে এই অঞ্চলে। ঝোড়ো হাওয়া

জোয়ারের সময় অস্বাভাবিক জল বেড়ে যাওয়া-চাষের অনুপযুক্ত লোনাভূমি এখানকার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এর মাঝেও এর জীববৈচিত্র্য আকর্ষণীয়। এই প্রতিকূল আবহাওয়া অঞ্চলে দারিদ্র্য ও কঠোর জীবন সংগ্রামে ঋদ্ধ মানুষের সঙ্গী একজাতীয় ছোট ভেড়া-যার স্থানীয় নাম 'গাড়োল' বা 'মেড়া'। এই জাতীয় ভেড়া বর্তমানে এর কিছু বিশেষ গুণের ফলে সারা পৃথিবীতে বিশেষতঃ গবেষকদের কাছে অত্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই জাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও পালনের দিক নিয়ে আলোচনা করলে জাতটির উন্নয়ন করা সম্ভব।

জাতটি কেমন? এই জাতের ভেড়ার বোকা বোকা ধরণধারন, সরলতা, সামান্য কারণে চমকে ওঠা ইত্যাদি কারণে এই ভেড়া 'গাড়োল' নামে সকলের কাছে জনপ্রিয়। 'চূড়ান্ত বোকা' বা 'বুদ্ধিহীন' কে চলতি ভাষায় 'গাড়োল' বলে। এছাড়া এর ছোট আকৃতির কানের জন্য এর আরেক নাম 'মেড়া' বা 'কানকাটা'।

কবে থেকে এই ভেড়া সুন্দরবনে আছে তা সঠিক না জানলেও অনুমান করা হয় যে অতি আদিম কালে 'আফ্রিকা' ও 'অস্ট্রেলিয়া'-এর মানুষদের সাথে অথবা 'আর্য' বা 'মুসলিম'-দের প্রবেশের সাথে সাথে এই ভেড়ার পূর্বপুরুষ মানুষের হাত ধরে সুন্দরবনে প্রবেশ করে। তারপর ধীরে ধীরে এই গরম-জলীয়-লবনাক্ত আবহাওয়া, অপ্রতুল খাদ্য, বিভিন্ন রোগজীবাণুর সংক্রামণ ইত্যাদির সাথে লড়াই করতে করতে এই ভেড়ার মধ্যে কিছু বিশেষ গুণের সমষ্টি ঘটে। এই বিশেষ গুণসমষ্টি যেমন একবারে অনেক বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা, বিভিন্ন রোগ ও লোনাজলের প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদি গাড়োল ভেড়াদের আজও এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই সব বিরলগুণ বংশানুক্রমে (জিনের মাধ্যমে) পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত ও বিদ্যমান।

দেখতে কেমন? এই জাতের ভেড়া সাধারণতঃ সাদা, ধূসর, কালো এবং বাদামি রঙে অথবা এদের মিশ্রিত রঙে পাওয়া যায়। যদিও সাদা ও ধূসর রঙের ভেড়াই সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। এই ভেড়ার গা বিবর্ণ, সোজা চুলের মতলম্বা পশমজাতীয় লোম দিয়ে ঢাকা থাকে। বছরে এই লোম দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪-৫ সেমি বাড়ে। যদিও মাথা, মুখ, পেট এবং পায়ে লোম গজায় কিন্তু তা লম্বা হয় না।

এদের মুখমন্ডল সাধারণতঃ লম্বাটে হয় এবং মাথার দুপাশে ধূসর রঙের শিং গজায়। এর শিং মাপে ২-৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। তবে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ভেড়ার ৬০ শতাংশ ও স্ত্রী ভেড়ার ৯৭ শতাংশে আদৌ কোন শিং গজায় না। এদের কান ছোট। লম্বায় প্রায় ৩ সেমি পর্যন্ত হয়। অন্য জাতের ভেড়অর চেয়ে এদের লেজ ছোট মাপের এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫-১০ সেন্টিমিটার।

গাড়োল ভেড়ার গড়ন অন্য জাতের ভেড়ার থেকে ছোট আকারের। মুখমন্ডল তেকোনা এবং শরীরের একটু ওপরে থাকে। এদের নাক এবং চোয়াল বিস্কুট অথবা কালো রঙের। কালো চোখ, সরু গলা এবং পা, কালো খুর ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্য এদের অন্য ভেড়া থেকে সহজেই আলাদা করে চেনা যায়।

গাড়োল ভেড়ার মাংস ও লোমের মান ঃ গাড়োল ভেড়অর ওজনের ৬০ শথাংশ পরিমান মাংস পাওয়া যায়। যদিও স্ত্রী ভেড়ার মাংসের মান পুরুষ ভেড়ার চেয়ে নিম্নমানের হয়।

গাড়োল ভেড়ায় গায়ে বছরে প্রায় ৪০০ গ্রাম ৫ সেমি লম্বা লোম জন্মায়। যদিও বর্তমানে বাজার না জানার জন্য এই লোম বিক্রি হয় না।

গাড়োল ভেড়ার বিভিন্ন রোগ ঃ এই জাতের ভেড়া প্রাকৃতিক কারণে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ সক্ষম। যদিও কমবয়সে বিশেষতঃ ২ মাস বয়সের নিচে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করতে পারে না। এই সময় মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। গাড়ল ভেড়অ বিভিন্ন কৃমি জাতীয় পেটের রোগে এবং অন্যান্য রোগে ভোগে। বিশেষতঃ স্ত্রী ভেড়ার মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য রোগের মধ্যে লালা ঝরা, জ্বর, লোম ওঠা ইত্যাদি রোগ বেশী করে দেখা যায়। সঠিক সময় চিকিৎসা করলে এই সব রোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

গাড়োল ভেড়া সংক্রান্ত গবেষণা ঃ বর্তমানে এই ভেড়ার জাতটি সারা বিশ্বের প্রাণী বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কারণ এর বিশেষ তিনটি গুণ যা অন্য জাতের ভেড়ার মধ্যে খুবই বিরল। প্রথমতঃ এরা একসঙ্গে ২-৩টি কখনও ৪টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয়। এছাড়া এদের লোনা জল সহ্যক্ষমতা এবহং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ শক্তি গবেষকদের কাছে অতি মূল্যবান। বিশেষতঃ একসঙ্গে বেশি বাচ্চা দেওয়া যা এদের বংশানুক্রমিক, তার ধারক (gene) এর ব্যবহার করে অন্য জাতের ভেড়া ও প্রাণীদের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করতে পারলে উন্নততর ভেড়ার জাত তৈরী করা যেতে পারে - যা অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্যান্য গুণগুলোও অন্য জাতের ভেড়ার মধ্যে সঞ্জাত করা সম্ভব হতে পারে। এছাড়া এই ভেড়ার গুণাবলী ও সঠিক পালন পদ্ধতি নিরুপণে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে। এই বিরল গুণ সঞ্জাত 'গাড়োল' এর পালন বর্তমান প্রাণীপালকদের কাছে বিকল্প অর্থনৈতিক হাতিয়ার হওয়ার দাবি রাখে।

❖ ভেড়া পালনের প্রয়োজনীয় খবর ঃ

ভেড়া ও ভেড়া থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারীকরণ ঃ

যে কোন ব্যবসা শুরু করতে গেলে যেমন ব্যবসার পণ্যের বাজার সমীক্ষণ করে নিতে হয়, ভেড়অ পালনের ক্ষেত্রেও তেমন করা খুবই দরকার। আর দেশে তথা পশ্চিমবাংলায় ছাগলের মাংসের বাজার সবথেকে বড়। তাই যেসকল অঞ্চলে ভেড়ার মাংসের চাহিদা বেশী আছে সেই জায়গাতে ভেড়া পালন লাভজনক হতে পারে। বাজারজাত করার সময় পশ্চিমবঙ্গের ৬-৭ মাসের ভেড়ার গড়ে ১৬ কেজি ওজন হয়। ঐ সময়ে অন্যান্য উন্নত বা বিদেশী ভেড়ার ওজন ২৬-৩০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এরাজ্যে যেহেতু মাংসের জন্যই মূলতঃ ভেড়া পালন করা হয় সেই কারণে ভেড়ার মাংসের বাজার সমীক্ষণ করা একান্ত জরুরী। এরাজ্যে ভেড়ার উল গুণমানে অনুন্নত কারণ এই উল সাধারণত কার্পেট তৈরীতে কাজে লাগে। ভারতবর্ষে ২০০৩ সালের প্রাণী সুমারী অনুযায়ী এদেশে প্রায় ৬১.৪৭ মিলিয়ন ভেড়া আছে এবং ২০০৩ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতের উৎপাদিত মোট উলের পরিমাণ ৪৪৫০ মিলিয়ন কেজি। চর্মজ শিল্পে ভেড়ার চামড়া মোটা দামেবিক্রি হয়। চামড়ার কোট, জ্যাকেট, জুতো হাতের গ্লাভস্ ইত্যাদি তৈরী করতে ভেড়ার চামড়া কাজে লাগে। ভেড়ার পায়খানা চাষের জমিতে উৎকৃষ্ট সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভেড়ার পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বিশেষ করে ভেড়ার অন্ত্র শল্য চিকিৎসার দ্রব্য বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজে লাগে।

ভারতবর্ষের ৫ মিলিয়নের বেশী গৃহস্থ ভেড়া, ছাগলের মতো ছোট প্রাণী পালনের মধ্যে দিয়ে তাঁদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। যেসব এলাকায় উৎকৃষ্ট শস্য চাষ সব্জি চাষ কিংবা নিদেন পক্ষে গরু-মহিষ ও পালন করা সম্ভব নয়, সেইসব ক্ষেত্রে ভেড়া পালনই ক্ষুদ্র, প্রান্তিক চাষী ও ভূমিহীন শ্রমিকের জীবনধারণের অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে।

❖ ভেড়া পালনে বীমাকরণ ঃ

কেন্দ্র সরকারের অধিগৃহীত বীমা সংস্থা 'দি নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড' প্রাণী পালনের জন্য বীমা করতে সাহায্য করে। ভেড়া পালনের সময়ে জীবিত ভেড়ার বীমা করা থাকলে তাতে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। ঐ কোম্পানী ভেড়ার খামার ঘর, জীবিত ভেড়া ইত্যাদি আনুষঙ্গীক অনেক বিষয়ে বীমা করে প্রাণীপালনের ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা কমাতে সাহায্য করে।

প্রতি মাসে সামান্য নির্দ্ধারিত প্রিমিয়ামের মূল্য দেবার সাপেক্ষে প্রাণী পালনে বীমাকরণের সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। এতে প্রাণী পালন ব্যবসার ঝুঁকি কমে।

❖ ভেড়া পালনের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য খবর পেতে যোগাযোগ স্থান ঃ

যে কোন ব্যবসার মত লাভজনক ভেড়া পালনের ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রশিক্ষণ না নেওয়া হলে ভেড়া পালন কখনই লাভজনকভাবে করা যায় না। তাছাড়া প্রাণী পালককে ভেড়া পালনের সমস্তরকম দরকারী তথ্য জেনে নিয়েই ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভেড়া পালনের কাজে নামতে হবে।

প্রতি জেলায় একটি করে 'কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র' আছে। সেখানে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য খোঁজ খবর নিয়ে ভেড়া পালন শুরু করা উচিত। এজন্য, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রকল্প আয়োজকের সব যোগাযোগ করতে হবে। এখানে ভেড়ার বাচ্চাও পালন করার জন্য কেনা যেতে পারে।

যে কোন রাষ্ট্রীয় প্রাণী খামারের যুগ্ম বা সহ-অধিকর্তা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

যে কোন কৃষি ও প্রাণী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ অধিকর্তার নিকটে চিঠি লিখে, ফোন করে বা সাক্ষাতের যোগাযোগ করা যায়।

রাজ্য সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের অধীনস্থ জেলায় উপ-অধিকর্তা কিংবা ব্লকে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে প্রশিক্ষণ, বাচ্চা ভেড়া বা অন্যান্য খবর পাওয়া যেতে পারে।

অনেক সরকারী, বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিও এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের জন্য প্রাণীপালনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন, প্রাণীপালনের কাজে উৎসাহিত করে থাকেন।

ব্যাংকের মাধ্যমে লোন নিয়ে কিংবা সরকারী প্রকল্পের অনুদান নিয়ে প্রাণীপালক, খামারীভায়েরা স্বনিযুক্ত প্রয়াসের মাধ্যমে ভেড়া ও অন্যান্য প্রাণীপালনের কাজে এগিয়ে আসছেন। সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ থাকা আবশ্যিক। ঐসব ব্যাংকের অধিকর্তা কিংবা সরকারী প্রকল্পের আধিকারিকের কাছেও প্রাণীপালনের খোঁজ খবর নেওয়া যেতে পারে।

৩

পুষ্টি ও খাবার

ছাগল/ভেড়া পালনের লাভ লোকসান নির্ভর করে খাবারের উপর। ছাগলের/ভেড়ার খাবার থেকে মাংস, দুধ, চামড়া ও পশম উৎপাদন হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ খাবার যদি পুষ্টিগুণে ভরপুর না হয় বা পুষ্টিকর খাদ্য ছাগল/ভেড়াকে সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় খেতে না দেওয়া হয় তবে ছাগলের/ভেড়ার বৃদ্ধি কমে যায়, মাংস ও দুধের উৎপাদন কমে যায়, চামড়া ও পশমের মান কমে যায়। প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়, মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। সর্বোপরি লাভের হার কমে যায়। তবে নিবিড় কৃষিব্যবস্থা ও চারণভূমির অপ্রতুলতার জন্য আজকাল ছাগল/ভেড়া পালন কমে এসেছে। এছাড়া কৃমি ও অন্যান্য রোগ বেশি হওয়ায় মাঠে ছেড়ে ছাগল/ভেড়া পালনের ক্ষেত্রে মৃত্যুজনিত ক্ষতিও হয়ে থাকে। মুরগীর মত সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় 'ডিপলিটার' সিস্টেমেও ছাগল/ভেড়া পালন করা যায়। সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে এই পদ্ধতিতে মৃত্যুর হার খুব কম। কিন্তু এই পদ্ধতিতে খরচের পরিমাণ অনেক বেশি। যেহেতু সম্পূর্ণ দানা জাতীয় খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া লাভজনকভাবে ছাগল/ভেড়া চাষ করতে হলে শতকরা ৬০ ভাগ ব্যয় শুধুমাত্র খাবারের জন্য হয়ে থাকে। সুতরাং অধিক উৎপাদনে প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবারের যোগান দেওয়া ও ঐ খাদ্যের পুষ্টিগত গুণাগুণ সম্বন্ধেও সঠিক ধারণা থাকে। আর এই পুষ্টিকর খাবার সুষম খাদ্য, সবুজ ঘাস ও লতাপাতা ইত্যাদি সঠিক পরিমাণে খাইয়ে মেটানো যায়। তবে ছাগলের/ভেড়ার জন্য ঘাস চাষসহ বড় আকারের খামার স্থাপন করলে এবং ছাগল/ভেড়া থেকে প্রাপ্ত মাংস, দুধ, চামড়া, পশম বা লোম এবং উপজাত দ্রব্য বিক্রির সুব্যবস্থা থাকলে এই পদ্ধতিতে লাভজনকভাবে ছাগল/ভেড়া চাষ করা সম্ভব।

● **ছাগল/ভেড়া কি খায় ঃ** কথায় বলে 'ছাগলে কিনা খায়'। কথাটি বাংলার কালো ছাগলের/ভেড়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এদের খাবারে কোন বাছবিচার নেই। মাঠে ছেড়ে ছাগল/ভেড়া পালন করলে ছাগল/ভেড়া তার প্রয়োজনীয় খাবারের ৭০ শতাংশ নিজেরাই জোগাড় করতে পারে এবং অল্প দানা জাতীয় খাবার দিলেই চলবে। এতে ছাগল/ভেড়া পালনে খরচের পরিমাণ কম হয়, তাছাড়া ছাগল/ভেড়া কচি ঘাস, আগাছা, লতাপাতা খেতে খুব ভালবাসে। কাঁঠাল পাতা, কুলপাতা, সজ্‌নে, নিমপাতা, বক্‌ফুল, নটে, কপি, মূলা, পালং, গাজর প্রভৃতি পাতা এরা খেয়ে থাকে। সিম, বরবটী, অড়হর পাতা ছাগল/ভেড়া ভাল খায়। এছাড়া তরিতরকারির খোসা, চারিদিকে পড়ে থাকা কমদামী খাবার খাইয়েও এদের পালন করা যায়। তবে অধিক উৎপাদনের জন্য সুষম খাদ্য এবং চাষ করা সবুজ খাদ্য যেমন বারসীম, লুসার্ন, কাউপি, ওট্‌স, ভুট্টা, জোয়ার ইত্যাদি খাওয়ানো দরকার। সুবাবুলের পাতা বেশি পরিমাণে খাওয়ানো ভাল নয়।

● **ছাগল/ভেড়া কি পরিবেশ ধ্বংস করে?** ছাগল/ভেড়া ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ালে যে খাদ্য গ্রহণ করে তার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আগাছা, ৩০ ভাগ ঘাস ও ১০ ভাগ লতাপাতা থাকে। ছাগল/ভেড়া সহজে খেত খামারে বা চাষের জমিতে ঢোকে না বরং চারপাশের উঁচু আইলে ঘাস বা লতাপাতা খুঁটে খুঁটে খায়। বেড়া ভেঙে না ঢুকে দুপায়ে ভর দিয়ে লতা-পাতা সংগ্রহ করে। আগাছা, লতাপাতা, বীজ ইত্যাদি খাওয়ার পর মলের সঙ্গে চারণভূমিতে বহু অক্ষত বীজ ছড়িয়ে পড়ে। বর্ষার জলে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন সবুজের সৃষ্টি হয়। এছাড়া মল জমিতে উর্বর সার হিসাবে কাজ করে। রাজস্থানের মরুভূমির বিস্তীর্ণ এলাকা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঐ এলাকায় ছাগল/ভেড়া ভেড়া চাষ করে। পশ্চিমবঙ্গের খরাপ্রবণ এলাকায় পরিকল্পিতভাবে ছাগল/ভেড়া-ভেড়া চাষ করলে পরিবেশ আরও উন্নত হবে এবং জনবসতির পক্ষে হিতকর হবে।

● **খাদ্য উপাদান ঃ** অন্য প্রাণীর ন্যায় ছাগলের/ভেড়ারও জীবন ধারণ, উৎপাদন, প্রজনন, শক্তি ও ক্ষয়রোধে ৬টি উপাদান বিশেষ প্রয়োজন। যেমন—**(১) শর্করা বা শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট), (২) প্রোটিন বা আমিষ, (৩) ফ্যাট বা তৈল পদার্থ, (৪) ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, (৫) খনিজ পদার্থ বা ধাতব লবণ (মিনারেল মিক্সচার) ও (৬) জল।**

ছাগলের/ভেড়ার বিভিন্ন বয়সে ঐ উপাদানগুলির নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োজন। তাছাড়া অধিক উৎপাদন, প্রজননের সময় ঐ উপাদানগুলির মাত্রাও বেশি পরিমাণে লাগে। আবার বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে (যেমন—ভুট্টা, ভূষি, খইল বা সবুজ ঘাসে) ঐ উপাদানগুলি ভিন্ন মাত্রায় থাকে। তাই প্রয়োজন খাদ্যের উপাদানগুলি সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট ধারণা থাকা এবং কোন খাদ্যে কি মাত্রায় ঐ উপাদানগুলি থাকে তাও জানা দরকার।

শর্করা (কার্বোহাইড্রেট) ঃ শর্করা দেহের এনার্জি বা শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস। এই এনার্জি শরীর রক্ষার জন্য, অধিক কাজের জন্য, হৃৎপিণ্ড ও মাংসপেশি পরিচালনার জন্য, বৃদ্ধির জন্য দুধ উৎপাদনের জন্য ও কাজে প্রয়োজন। বাড়তি শর্করা চর্বি হয়ে দেহে জমে ও প্রয়োজনে দেহের কাজে লাগে। এই খাবার আবার ২ ধরনের হয়। যেমন—

- **নাইট্রোজেনযুক্ত খাবার ঃ** যে খাবারে শর্করার ভাগ ও স্টার্চ বেশি থাকে। যথা—ভুট্টা, গম, জোয়ার, বাজরা, ওট, বার্লি ইত্যাদি অর্থাৎ বাজারে যে দানা পাওয়া যায়।
- **আঁশযুক্ত খাবার ঃ** যে খাবারে সেলুলোজ ও লিগনিন থাকে। যথা শুটি জাতীয় খাবার—কলাই, মটর, বারসীম, লুসার্ন ইত্যাদি এবং আশুটি জাতীয় গাছ যাতে শর্করা ও স্টার্চের ভাগ খুব কম যথা—ঘাস, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতির গাছ। ছাগলের/ভেড়ার খাদ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ শর্করা জাতীয় খাদ্যের মাধ্যমে পাওয়া যায়। যদিও এই জাতীয় খাদ্যের প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ লবণও থাকে।

✶ **প্রোটিন ঃ** দেহ গঠন, শরীর রক্ষার জন্য মাংস, দুধ, পশম, উৎপাদন, দৈহিক বৃদ্ধিৰ জন্য ও গর্ভস্থ বাচ্চার ও মায়ের পুষ্টির জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন। বিভিন্ন খইল জাতীয় খাদ্য যেমন বাদাম খইল, তিলের খইল, সোয়াবিন খইল, তিসি খইল ইত্যাদিতে প্রায় ৩০ থেকে ৪৫ ভাগ প্রোটিন থাকে। তাছাড়া গুটি জাতীয় সবুজ ঘাসে যেমন বারসীম, লুসার্ন, কলাই, মটর ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে।

✶ **ইউরিয়া ঃ** এছাড়া গরুর মত ছাগলের/ভেড়ার খাদ্যেও অল্প পরিমাণে ইউরিয়া দেওয়া যায়। যদিও পূর্ণবয়স্ক ছাগল/ভেড়া ছাড়া অন্য কোন ছাগল/ভেড়াকে ইউরিয়া খাওয়ানো যায় না। দুধ দেওয়া ছাগল/ভেড়াকে খাওয়ালে বিষক্রিয়া হতে পারে। ফরেজ, (রাফেজ/তন্তুময় খাবার) খাবারে মোট প্রোটিনের $\frac{\text{ত}}{\text{ত}}$ ভাগ ইউরিয়া মেশানো যায়। কনসেনট্রেট্ (ঘনীভূত) খাবারে মোট প্রোটিনের প্রায় $\frac{\text{ত}}{\text{ত}}$ ভাগ ইউরিয়া মেশানো যায় যদি সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাসও খাওয়ানো হয়। ৩ সপ্তাহ সময় দরকার ইউরিয়া খাওয়ানো অভ্যাস করতে। প্রথম প্রথম খেতে চাইবে না। অন্য খাবারের সঙ্গে অল্প পরিমাণ মিশিয়ে এবং পরে পরিমাণ বাড়িয়ে অভ্যাস করাতে হয়।

✶ **ফ্যাট ঃ** দেহে শক্তি বা এনার্জি জোগানোর জন্য। অস্থির সন্ধিস্থল তরল রাখতে ও ভিটামিন-এ, ডি, ই, কে শোষণে সাহায্য করতে ফ্যাটের প্রয়োজন। অধিক শক্তি উৎপাদনে যা শর্করার দ্বিগুণেরও বেশি এর প্রয়োজন। স্নেহ জাতীয় পদার্থে চর্বি ও তেল থাকে। চর্বি স্বাভাবিক চাপে ও তাপে কঠিন ও তেল তরল থাকে। ফ্যাট বিভিন্ন রকম খইল যথা বাদাম, সোয়াবিন, তিল, তিসি ইত্যাদিত এবং দানাশস্যে থাকে।

✶ **ভিটামিন ঃ** বৃদ্ধির জন্য, রোগ জীবাণুদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ভিটামিনের প্রয়োজন। অভাবে বাচ্চাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না। হাড় নরম হয়, চোখে দেখতে পায় না, খাওয়ার পরিমাণ কমে যায়। সবুজ ঘাস, লতা, পাতা, আগাছায় প্রচুর ভিটামিন আছে। ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্স ছাগলের/ভেড়ার রুমেনে তৈরি হয়ে থাকে। ভিটামিন-ডি সূর্যকিরণ থেকে পাওয়া যায়। তবে অধিক দুধ উৎপাদনের জন্য ভিটামিন বিশেষ প্রয়োজন।

✶ **খনিজ লবণ বা মিনারেল ঃ** দেহ গঠনে ও দেহের সমস্ত কাজে বিরাট ভূমিকা আছে। অভাবে নানারকম রোগ হতে পারে। খাবার লবণ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সালফার বেশি প্রয়োজন। বিশেষ করে দুধ উৎপাদনের জন্য এগুলির বেশি প্রয়োজন। তাছাড়া আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, আয়োডিন, কোবাল্ট, তামা, দস্তারও প্রয়োজন নির্দিষ্ট পরিমাণে। দানাশস্য, দানা জাতীয় খাদ্যের উপজাত দ্রব্যে (ভূষি), খইল জাতীয় খাদ্যে (বাদাম, সোয়াবিন ইত্যাদি) ও সবুজ ঘাসে এই পদার্থগুলি থাকে। বাজারে কোন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে নিলে এই মিনারেল মিক্সচার সংগ্রহ করে অভাব পূরণ করা যায়।

✶ **জল ঃ** জল ছাড়া একটি ছাগল/ভেড়া কয়েক দিনের মধ্যে মারা যায় কিন্তু শুধুমাত্র জল খেয়ে সে অনেকদিন বাঁচতে পারে। জলের অভাব হলে খাদ্যের পরিপাক হয় না ও দূষিত পদার্থের নির্গমন হয় না। জল দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। দুধের ৮৭ ভাগ জল। তাই অধিক দুধের জন্য জলের পরিমাণও বেশি হওয়া দরকার। ১৮-২০ কেজি ওজনের একটি ছাগলের/ভেড়ার প্রতিদিন প্রায় ৪৫০-৭০০ মিলি লিটার জল প্রয়োজন।

✶ **সুষম খাদ্য ঃ** ছাগলের/ভেড়ার দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়ক্ষতি পূরণ, অধিক উৎপাদন ইত্যাদির জন্য যে সব উপাদান দরকার সেগুলি উপযুক্ত পরিমাণে যদি কোন খাদ্যে থাকে তবে তাকে সুষম খাদ্য বলে। সুষম খাদ্য তৈরি করার সময় মনে রাখতে হবে খাদ্য যেন সস্তা, সুস্বাদু হয় এবং যে উপকরণ বা উপাদানগুলি দিয়ে সুষম খাবার তৈরি হবে সেগুলি যেন সহজলভ্য ও কম দামের হয় এবং শুকনো উপাদানগুলির জলীয় অংশ ১০ শতাংশের বেশি না হয় অর্থাৎ শুষ্ক পদার্থ (ড্রাই ম্যাটার) গড়ে ৭০ ভাগ থাকে।

সুষম খাদ্যে পাচ্য বা হজমযোগ্য প্রোটিন থাকবে ১৪-১৬ ভাগ এবং মোট পাচ্য পুষ্টিকর পদার্থ থাকবে ৬৮-৭২ শতাংশ। এই সুষম খাবার বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন ঃ (১) বাচ্চার জন্য ফিড স্টার্টার বা মিল্ক রিপ্লেসার বা দুধের বিকল্প খাবার, (২) বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য গ্রোয়ার খাবার, (৩) বড় ছাগলের/ভেড়ার জন্য ফিনিসার খাবার।

বিভিন্ন খাদ্য উপাদানে পুষ্টিগুণের মাত্রা

প্রকার	নাম	প্রোটিন %	টি.ডি.এন %
আমিষ সরবরাহকারী	সরিষা খইল	২৮-৩২	৭০-৭২
	বাদাম খইল	৪০-৪৫	৭০-৭২
	তিল খইল	২৮-৩০	৭০
	নারকেল খইল	৩৪-৩৮	৭০-৭৫
শক্তি সরবরাহকারী	গম	৯-১০	৮০
	যব	৮-১০	৮০
	ভুট্টা	৮-৯	৮৫
	চাল	৭-৭.৫	৮০
কৃষি উপজাতীয়	ধানের কুঁড়ো	১৩-১৪	৬০
	গমের কুঁড়ো	১৩-১৫	৬০
	মুগ চুনি	১৮-২০	৬৫
	মুসুর চুনি	১৮-২২	৬৫
	মটর চুনি	১৬-১৮	৬২
	মুগের ভূষি	১০-১৪	৫৫
	খেসারির ভূষি	১০-১২	৫০
	ঝোলা গুড়	—	৭০
চাষযুক্ত সবুজ ঘাস			
(ক) শিম্ব গোত্রীয়	বারসীম	২-৩	১০-১২
	মটর	১.৫-২.০	৮-১০
	বিন	২-২.৫	৯-১১
(খ) অশিম্ব গোত্রীয়	ভুট্টা	১-১.২	৯-১২
	জোয়ার	১-১.১	৯-১২
	বাজরা	১.১	৯-১১
	নেপিয়ার	১.২	১০-১২

প্রকার	নাম	প্রোটিন %	টি.ডি.এন %
অন্যান্য গাছের পাতা	আম	৩.০	১৩-১৫
	কাঁঠাল	৩.২	১৫
	সিরিষ	২.৯	১২
	বাবুল	২.৮	১০
	বট	৩.১	১৪
	অশ্বত্থ	৩.০	১৩
	পাকুড়	২.৪	১০-১২
পরিত্যক্ত সবজি	মূলা	—	৪-৫
	গাজর	—	৪-৭
	ফুলকপি পাতা	০.৫০	৪-৫
	বাঁধাকপির পাতা	০.৫০	৪-৫
	মটরের খোসা	১.০	১-১০
চারণ ভূমির ঘাস	দূর্বা	২.৪	১২-১৪
	মুথা	১.৩	৮-১০
	শ্যামা	১.০-১.২	৮-১০
পরিত্যক্ত ফল ও	আম	—	১০-১২
ফলের খোসা	কাঁঠাল	—	১২-১৫

- **ছাগলের/ভেড়ার খাবারের শ্রেণীবিভাগ ঃ** ছাগলের/ভেড়ার খাদ্যকে দুইভাগে ভাগ করা হয়—

★ **রাফেজ বা তন্তুময় খাদ্য ঃ** যে খাদ্যে ফাইবার/আঁশ/তন্তু বেশি থাকে কিন্তু পুষ্টিকরহ পদার্থ কম থাকে, যেমন—বিচালি, সবুজ ঘাস ইত্যাদি।

- গাছের পাতা, বাবলা, বট, অশ্বত্থ, কাঁঠাল, বেল, আম, জাম, পেয়ারা, কদম, রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, পিপুল, অশোক ইত্যাদি।
- গুল্মজাতীয় বা ঝোপঝাড় ঃ কুল, জবা, টগর ইত্যাদি।
- ঘাসজাতীয় ঃ দূর্বা, মুথা, শ্যামা, বাজা, অঞ্জন প্রভৃতি।
- সবজির না খাওয়া অংশ ঃ গাজর, মুলো, বীট, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও অন্যান্য।
- সবুজ ঘাস (চাষ করা) ঃ বারসীম, লুসার্ন, বরবটি, গাইমুগ, জোয়ার, ভুট্টা (কচিপাতা) প্যারা ইত্যাদি।
- 'হে' বা শুকনো ঘাস এবং জই-এর হে, অড়হর, ভুসি ইত্যাদি।

এই রাজ্যে বেশিরভাগ ছাগল/ভেড়া মাঠে চরে আহার সংগ্রহ করে। বর্ষার সময় চাষীরা জমিতে চাষ-আবাদের জন্য এই সময় অতিরিক্ত ছাগল/ভেড়া বিক্রি করে এবং স্ত্রী ছাগল/ভেড়াগুলিকে রাখে। চাষীরা বিভিন্ন ধরনের গাছের ডাল কেটে গোয়ালের বা ছাগলের/ভেড়ার থাকার জায়গায় ঝুলিয়ে রাখে, যা খেয়ে ছাগল জীবনধারণ করে। অন্যান্য প্রাণীর কাছে যে সব লতাপাতা তেতো বা স্বাদে ভালো লাগে না, তা ছাগল/ভেড়া অনায়াসে খেয়ে হজম করতে পারে। যদিও সবুজ রসালো লতাপাতা ও গুল্ম জাতীয় গাছের কচি পাতা এদের বিশেষ পছন্দ তা হলেও শুষ্ক লতাপাতা, 'হে' প্রভৃতি খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। 'সাইলেজ' ছাগল/ভেড়া খায় না। ছাগল/ভেড়া যে সমস্ত লতাপাতা গুল্ম খায়, দেখা গেছে সেগুলির খাদ্যগুণ বেশি, বিশেষ করে প্রোটিন ও ফসফরাস। ঘাস লতাপাতাতে কিছু খনিজলবণের অভাব রয়েছে, সেইজন্য কিছু পরিমাণ খনিজ লবণ খাওয়ালে এদের বৃদ্ধি ও প্রজননের বিশেষ সহায়ক হবে। অতিরিক্ত থাইরক্সিন হরমোন ক্ষরণের জন্য আয়োডিনমূলক লবণ বিশেষ দরকার।

✶ শুষ্ক খাবার ঃ

বাবলা ফল, বিভিন্ন রকম ডালের ভূষি, গমে ভূষি বিভিন্ন ধরনের খইল যেমন—সরিষা, তিল, তিসি, বাদাম, সূর্যমুখী প্রভৃতি। এছাড়অ ডাল জাতীয় গাছের শুকনো লতাপাতা প্রভৃতি।

একমাত্র উত্তরের তরাই অঞ্চল ও পশ্চিমের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার ল্যাটেরাইট অঞ্চল ছাড়া চারণভূমি খুবই কম। সাধারণভাবে বর্ষার শুরু থেকে শীতের প্রথম পর্যন্ত ছাগল/ভেড়া মাঠে বিচরণ করে তার খাদ্য জোগাড় করতে পারে। কিন্তু শীতের সময় নভেম্বর মাস থেকে গ্রীষ্মের এপ্রিল পর্যন্ত সবুজ ঘাস ও লতাপাতা কমে যায়, ফলে খাবারের অভাব দেখা দেয়। এই সময় সবুজ ঘাসের অভাব থাকায় চাষীবন্ধুদের ছাগলের/ভেড়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। চাষীর ঘরের ছোলা, বাদাম, মুগ প্রভৃতি গাছের শুকনো গাছ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস হলে তা শুকিয়ে রাখতে হবে। যদি এসব কিছু না পাওয়া যায় তাহলে বিচরণ করা ছাড়াও প্রতিদিন মাথাপিছু ১০০ গ্রাম দানা জাতীয় খাদ্যের মিশ্রণ দেওয়া দরকার।

✶ কনসেনট্রেট বা দানাযুক্ত খাদ্য ঃ

যে খাদ্যে তন্তুবা ফাইবার কম থাকে কিন্তু পুষ্টিকর পদার্থ বেশি থাকে, যেমন—দানাশস্য, খইল, ভূষি ইত্যাদি।

বয়স অনুসারে ছাগল/ভেড়াকে তিনপ্রকার সুষম খাদ্য খাওয়ানো হয়। (১) বাচ্চা ছাগলের/ভেড়ার জন্য খাদ্য (Kid starter) (২) বাড়ন্ত ছাগলের/ভেড়ার জন্য খাবার (Grower feed) এবং (৩) বড় ছাগলের/ভেড়ার জন্য সাধারণ খাবার। দানাজাতীয় সুষমখাদ্য বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। আবার প্রতিটি দানাশস্য বাজার থেকে আলাদা করে কিনলে তাতে খরচ কম পড়ে এবং খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

কিছু অপ্রচলিত খাবার আছে যা ছাগল/ভেড়াকে খাওয়ানো যেতে পারে। অপ্রচলিত খাদ্য বলতে

বোঝায় যা আগে কখনও খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। এই খাদ্য বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে যেমন—অপ্রচলিত শর্করা, প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। এই খাদ্য বেশি ব্যবহার করা হয় গরু ও পোলট্রির খাদ্যের উপাদান হিসাবে। যে সকল অপ্রচলিত খাদ্য গোখাদ্য বা পোলট্রির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা ছাগলের/ভেড়ার খাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ছাগলের/ভেড়ার জন্য ব্যবহার করা যায় এমন কয়েকটি অপ্রচলিত সবুজ খাদ্য হল—বাঁশ পাতা, নিমপাতা, শিরিষ পাতা, সুবাবুল ও তুঁত (মালবেরি) প্রভৃতি। এইসব পাতায় শুকনো অবস্থায় ৮-১২ শতাংশ প্রোটিন ও ৫০-৭০ শতাংশ শক্তিমূল্য থাকে। অপ্রচলিত তৈলবীজ—নিম খইল, করঞ্জা খইল, মহুয়া খইল ইত্যাদি।

প্রায় সমস্ত অপ্রচলিত খাদ্যে কোন না কোনরকম পুষ্টি নিরোধক বিষাক্ত উপাদান থাকে যা শরীরের পক্ষে শুধুমাত্র ক্ষতিকারকই নয়, তা প্রাণীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। এর ফলে বেশি পরিমাণ খাওয়ালে ক্ষতিসাধন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই সামান্য অপ্রচলিত খাদ্য খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত।

✶ ছাগল/ভেড়া রোজ কতটা খাবে ঃ

ছাগল/ভেড়া রোজ কতটা খাদ্য খাবে তা নির্ভর করে দেহের ওজনের উপর এবং কি জন্য ঐ ছাগল/ভেড়া পালন করা হচ্ছে তার উপর। গরু মত ছাগল/ভেড়াও সারাদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শুষ্ক পদার্থ বা ড্রাই ম্যাটার খায়। সুষম খাদ্য, বিচালি ইত্যাদিতেশতকরা ৯০ শতাংশ শুষ্ক পদার্থ ও কাঁচা ঘাস বা সবুজ ঘাসে শতকরা ২০ শতাংশ শুষ্ক পদার্থ থাকে। অর্থাৎ ১ কেজি কাঁচা ঘাস খেলে শুষ্ক পদার্থ খাওয়া হবে ২০০ গ্রাম এবং ১ কেজি সুষম খাদ্য খেলে শুষ্ক পদার্থ ড্রাই ম্যাটার খাওয়া হবে ৯০০ গ্রাম।

মাংসের জন্য ব্যবহৃত ছাগলে শুষ্ক পদার্থ দরকার প্রতিদিন ৩-৪ শতাংশ দেহের মোট ওজনের কিন্তু দুধের জন্য ব্যবহৃত ছাগলের/ভেড়ার জন্য দরকার ৫-৭ কেজি ড্রাই ম্যাটার দেহের মোট ওজনের প্রতিদিন।

একটি ছাগলের/ভেড়ার ওজন ১০ কেজি, ১৫ কেজি, ২০ কেজি পর্যন্ত হলে এবং প্রতিদিন ৫০ গ্রাম করে বৃদ্ধি হলে শুষ্ক পদার্থ দরকার যথাক্রমে ৪২৫ গ্রাম, ৬০০ গ্রাম ও ৭০০ গ্রাম।

সুষম খাবার বা কনসেনট্রেটেড মিক্সার বাজার থেকে সংগ্রহ করা যায় বা ইচ্ছা করলে বাড়িতে নিজেরা তৈরি করা যায়। প্রয়োজন কোন খাদ্যেরকি উপাদান কি পরিমাণে মেশাতে হবে। একটি কিড স্টার্টার বা ছোট বাচ্চার সুষম খাবারের নমুনা দেওয়া হল—

বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় (বাচ্চা, বাড়ন্ত, দুগ্ধবতী ইত্যাদি) খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণের মাত্রা

দেহের ওজন (কেজি)	শুকনো খাদ্য (গ্রাম)	প্রোটিন (গ্রাম)	টি.ডিএন (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	ফসফরাস
৫	১৮০	৩৯	১৩০	০.৪১	০.৩৮
১০	৪০০	৫৩	২৬০	০.৯২	০.৮৪
১৫	৫৪০	৬৮	৩৫০	১.১৩	২.০৮

(খ) দুধ উৎপাদনের জন্য ঃ

দেহের ওজন (কেজি)	শুকনো খাদ্য (গ্রাম)	প্রোটিন (গ্রাম)	টি.ডিএন (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	ফসফরাস
১০	৪৫০	৫৪	২৯০	৩.০০	২.২০
১৫	৬৭৫	৮১	৪৪০	৩.৪৮	২.৫২

(গ) গর্ভবতীর জন্য ঃ

দেহের ওজন (কেজি)	শুকনো খাদ্য (গ্রাম)	প্রোটিন (গ্রাম)	টি.ডিএন (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	ফসফরাস
২৫	৭৫০	৯১	৫৫০	২.৭০	২.১০
৩০	৯০০	১০৯	৬৬০	২.৮৮	২.৪৮

(ক) বাড়ন্ত/মাংস উৎপাদনের জন্য ঃ

(৪) সুষম খাবার তৈরী ঃ

(১) ছাগলের/ভেড়ার প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগাতে সুষম খাবার দেওয়া প্রয়োজন।

(২) সুষম খাবার বাড়ন্ত বাচ্চা অধিক উৎপাদনশীল ছাগলের/ভেড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(৩) সুষম খাবার মূলত দুপ্রকারের—

(ক) শর্করাযুক্ত (গম, যব, ভুট্টা, ভাঙা, চাল)

(খ) প্রোটিনযুক্ত (খইল, সয়াবিন, চুনি)

সুষম খাবার তৈরীর সময় জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

(১) খাদ্য উপাদান স্থানীয় এলাকায় পাওয়া যায় কিনা।

(২) যদি পাওয়া যায়—যেটা সারাবছর না সময় বিশেষে।

(৩) খাদ্য উপাদানের গুণাবলী, কোন ক্ষতিকর পদার্থ থাকে কিনা।

(৪) উপাদানগুলির বাজার দর।

(৫) সর্বোচ্চ কতটা পরিমাণ খাদ্যে মেশানো যায়।

(৬) ভিটামিন ও খনিজ লবণ সঠিক পরিমাণে মেশানো।

(৭) সঠিক সময় ধরে সংমিশ্রণ করা দরকার।

সুষম খাবার প্রদানের সময় কয়েকটি সতর্কতা অবশ্য পালনীয়—

(১) দানাযুক্ত সুষম খাবারে বেশি পরিমাণে ফসফরাস থাকে কিন্তু ক্যালসিয়াম থাকে কম যা পুরুষ ছাগলের/ভেড়ার মূত্রনালীতে পাথর সৃষ্টি করে, দুগ্ধবতী ছাগলের/ভেড়ার ক্ষেত্রে দুধ কমে যায় এবং ছাগল/ভেড়া মাটিতে শুয়ে থাকে। দাঁড়াতে পারে না।

উপাদান	ক্রিপ খাবারের উপাদান (প্রতি ১০০ কেজি) ৭ দিন থেকে ৬০ দিন পর্যন্ত	বাড়ন্ত/মাংস উৎপাদনকারী খাবার (প্রতি ১০০ কেজি)	দুগ্ধবতী ও গর্ভবতীর খাবার (প্রতি ১০০ কেজি)	প্রজননক্ষম পাঁঠার জন্য (প্রতি ১০০ কেজি)
ভুট্টাগুঁড়ো	৬০	১২	১০	২০
ডালচুনি	—	৩৫	৩০	১৮
যব	—	—	২০	—
গমের/ধানের কুঁড়ো	৭	৩০	৩০	৫৮
বাদাম খইল	২০	৫	—	
ঝোলাগুড়	—	৫	৭	৫
খনিজ মিশ্রণ	২	২	২	২
শুকনো মাছ	১০	—	—	
লবণ	১	১	১	১

(২) খইল জাতীয় খাদ্য বেশি পরিমাণে ব্যবহারে ছাগলের/ভেড়ার স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা ঃ

(১) ছাগলের/ভেড়ার সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয় ভিটামিন হল এ. ডি এবং ই।

(২) ভিটামিন বি এবং কে ছাগলের/ভেড়ার পাকস্থলীতে (রুমেন) উৎপন্ন করে।

(৩) খনিজ লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং সাধারণ লবণ একান্ত প্রয়োজন।

(৪) ক্যালসিয়াম, ফসফরাস খাদ্যে ২ : ১ অনুপাতে থাকা উচিত।

(৫) সাধারণত ছাগল/ভেড়া যে সমস্ত খাদ্য খায় তাতে খনিজ পর্যাপ্ত থাকে না, তাই খাদ্যে খনিজ লবণ মেশানো উচিত।

(৬) স্বল্পমাত্রিক খইনজলবণ যেমন—কপার, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট, আয়োডিন, আয়রন ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া দরকার।

(৭) বদ্ধ অবস্থায় ছাগল/ভেড়া পালন করলে এবং যদি সবুজ খাদ্যের অভাব থাকে সেই পরিস্থিতিতে খাদ্যে ভিটামিন এ. ডি ও ই মেশানো উচিত।

খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী ছাগল/ভেড়া পালন ঃ

(১) মাঠে চরানো—কোন অতিরিক্ত খাবার না দেওয়া।

(২) সাময়িক মাঠে চরানো এবং শুকনো খাবার দেওয়া।

(৩) না চরিয়ে শুধুমাত্র ঘরের মধ্যে রেখে প্রতিপালন।

● মাঠে চরানো ঃ

(১) অনাবাদী জমি এবং তৎসংলগ্ন ঝোপঝাড় বা জঙ্গলের পাতা খেয়ে পুষ্টি পরিপূরণ করে।

(২) চরে খাওয়ার ফলে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সব সময় পায় না, সেজন্য মাংস বা দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সারাবছর একটা তফাত চোখে পড়ে।

সুবিধা—অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুবই লাভজনক।

অসুবিধা—বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব।

● সাময়িক মাঠে চরানো এবং সামান্য শুকনো খাবার দেওয়া ঃ

(১) পশ্চিমবঙ্গে চারণভূমি না থাকলেও সময়ভেদে (গ্রীষ্ম এবং শীত) কিছুটা সময় চরানোর সুযোগ থাকে।

(২) অনেক সময় ছাগল/ভেড়াকে আলের মধ্যে দড়ি বেঁধে রাখা হয়।

(৩) কয়েক ঘণ্টা মাঠে চরানো ছাড়াও ছাগল/ভেড়াকে প্রয়োজনানুসারে দানাযুক্ত ভুষি খাবার দেওয়া দরকার।

(৪) অসুবিধা—বিভিন্ন প্রকার কৃমি জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব।

৪

ছাগল ও ভেড়ার রোগ এবং তার প্রতিকার

✶ ছাগলের/ভেড়ার ছোঁয়াচে রোগ বা প্লুরো নিউমোনিয়া ঃ

জাবাণু ঘটিত এই রোগটি শুধুমাত্র ছাগল/ভেড়াকে আক্রমণ করে। গরু মহিষ ও অন্যান্য প্রাণীরা এই রোগে আক্রান্ত হয় না। কেবল ছাগলের/ভেড়ার মড়ক লাগে। বৃষ্টিতে ভিজে, ঠাণ্ডা লেগে বা হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে ছাগলের/ভেড়ার সর্দিকাশি হতে থাকে। এই সময় ছাগল/ভেড়া বিভিন্ন রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। রোগ পুরানো হলে সর্দি জমতে থাকে, পরে তা নিউমোনিয়ায় পৌঁছে যায়।

রোগের লক্ষণ ঃ ছাগল/ভেড়া ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে নাক দিয়ে সর্দি ঝরতে থাকে, পরে ক্রমশঃ সর্দি হলুদ হয়। খাদ্যে অনীহা ও কোষ্ঠকাঠিন্য, জাবর কাটা বন্ধ করে। দেহের তাপমাত্রা ১০৪°-১০৭° ফারেনহাইট, স্টেথো লাগালে মুখে জল জমার ভাব বোঝা যাবে। খিদে কমে যায়। এক সপ্তাহের মধ্যে ছাগল/ভেড়া মারা যায়।

মাইকোপ্লাজমা মাইকয়ডিস ভার ক্যাপ্রি *(Mycoplasma mycoides ver capri)* নামক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সংক্রামক প্লুরো নিউমোনিয়া। (Contagopis Caprine Pluro Pneumonia or CCPP) রোগের সৃষ্টি করে। এটি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ। এতে একসঙ্গে অনেক ছাগল/ভেড়া আক্রান্ত হয় এবং দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নপরিবেশে পালন করলে এই রোগের সম্ভাবনা কম থাকে। ছাগলের/ভেড়ার যাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগে ও বৃষ্টিতে না ভিজে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাধারণত সর্দিকাশি ও নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাকটিরিয়া আক্রমণ করে থাকে বলে অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করা ভালো। যেমন—অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ইনজেকশড় বেশী মাত্রায় শিরায় করতে হবে তৎক্ষণাৎ বা সালফামেজাথিন (৩৩$\frac{৩}{৩}$ শতাংশ) হলে ৩০ মিলি একবার ইনজেকশন দিতে হবে। এছাড়াও অ্যাম্পিসিলিন, কক্সীসিলিন প্রভৃতি ব্রডস্পেকট্রাম ঔষদ ইনজেকশন দিতে হবে। তাপমাত্রা অধিক বৃদ্ধি পেলে জ্বর কমানোর ঔষদ প্রয়োগ করতে হবে। প্যারাসিটামল, নোভালজিন, বোলিন ইত্যাদি।

CCPP হলে অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধে ভালো ফল পাওয়া যায় না, আগে থেকে টীকা দিলে তবেই ঐ রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে।

দমন ঃ (CCPP Vaccine-IVRI) পাওয়া যায়, প্রথমে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এবং পরে প্রতি বছর টীকা নিলে এই রোগ দেখা যায় না। জীবন্ত জীবাণু দিয়ে টীকা দিয়ে দিতে হয়, পরিমাণ ০.২ মিলি. কানের ডগায়।

✶ গোট পক্স বা ছাগলের/ভেড়ার বসন্ত রোগ ঃ

এটি ভয়ানক ছোঁয়াচে, ভাইরাস ঘটিত রোগ, নিশ্বাস-প্রশ্বাস; চামড়ার ক্ষতের মাধ্যমে শরীরে রোগ জীবানু প্রবেশ করতে পারে। এই রোগে মৃত্যুর প্রকোপ বেশি, ভারতবর্ষে বিগত কয়েক বছরে ছাগল/ভেড়া মৃত্যুর হার দরিদ্র মানুষের অর্থনীতিতে অনেক ক্ষতি করেছে। দুই প্রকারে এই রোগ হতে পারে, চর্মজনিত ও শরীরের অন্তঃবিভাগে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ এই রোগে প্রথমে জ্বর হতে থাকে, তাপমাত্রা (১০৪°-১০৬° ফারেনহাইট) সর্দি, চোখ ও নাক দিয়ে জল পড়ে, পালনে ও মুখে, কানে ক্ষত বা জলফোস্কা দেখা যায়। বাঁট ও চোয়ালের নীচেও জলফোস্কা দেখা যায়। এই জলফোস্কা অনেকসময় থেকে পুঁজে পরিণত হয়। বাচ্চারা আক্রান্ত হলে মারা যায়। দেহের অন্যান্য স্থানে বসন্তের মত গুটি বের হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ আক্রান্ত ছাগল/ভেড়াকে সুস্থ ছাগল/ভেড়া থেকে আলাদা করে রাখতে হবে। বসন্তের গুটিগুলিকে হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড (H_2O_2) সম পরিমান গরম জলের সাথে মিশিয়ে ক্ষতের জায়গায় লাগাতে হবে। এর পর কোন অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ক্রিম ক্ষতের জায়গায় লাগাতে হবে। পক্স ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে ছাগল/ভেড়া ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই সময় ছাগল/ভেড়া যাতে অন্যান্য জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে না পারে তার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ দেওয়া যায়। যেমন অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, অ্যাম্পিসিলিন ইত্যাদির যে কোন একটা। বসন্ত রোগে কোন ছাগল/ভেড়া মারা গেলে তাকে মাঠে বা অন্য কোন খোলা জায়গায় ফেলা উচিত নয়। চুন মাখিয়ে গর্তে পুঁতে দিতে হয় ছাগল/ভেড়াটিকে।

এই রোগ প্রতিরোধেৰ জন্য আগে থেকে টীকা দেওয়া দরকার। এই রোগের ভ্যাকসিন বা টীকা পাওয়া যায়। ছাগল/ভেড়া প্রতি ০.৫ মিলি কানের ডগায় (১ ইঞ্চি ভিতরে) চামড়ার নীচে ইনজেকশন দিতে হবে। ইনজেকশন দেওয়ার আগে স্পিরিট বা আয়োডিন ব্যবহার করা চলবে না। ভ্যাগকসিন যেন রক্তনালিতে প্রবেশ করতে না পারে। ৩ মাসে প্রথমবার এবং তারপর প্রতি বছর একবার করে।

✶ এনটারোটক্সিমিয়া ঃ

এটি খুবই সংক্রামক, ক্লসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেন্স (*Clostridium perfrigenes)* নামক ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা ছাগলের/ভেড়ার এই রোগ হয়। সংক্রামিত খাদ্য ও জলের মাধ্যমে এই জীবানু শরীরে প্রবেশ করে। এই রোগে মৃত্যুর হার বেশী, রোগের স্থায়িত্ব ২-৩ দিন।

রোগের লক্ষণ ঃ এই রোগে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয় ও ছটপট করতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। পেটফোলা, পাতলা পায়খানা এবং কখনও কখনও রক্ত মলত্যাগ করতে থাকে। ঠিকমত পা ফেলতে পারে না, ধুলা, বালি, লাঠি ইত্যাদি চিবোতে থাকে। শেষে কোমায় (Coma) চলে আসে, দঁতে দাঁত লেগে যায়। পেশী অসাড় হয়ে যায়। সাথে সাথে টক্সিমিয়া থেকে কিডনি, হার্ট ও লিভার অকেজো হয়ে আক্রান্ত ছাগলের/ভেড়ার মৃত্যু হয়। বাচ্চা ছাগলের/ভেড়ার সহ্য ক্ষমতা কম হওয়ায় এই রোগে হঠাৎ মারা যায়। এই রোগের স্থায়িত্ব ১-৪ দিন।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ বছরের যে-কোন সময় টিকা নেওয়া যায়। গর্ভবতী ছাগল/ভেড়া বাচ্চা দেওয়ার তিন সপ্তাহ আগে এই রোগের টিকা দিতে পারে। মালটি কমপোনেন্ট ক্লসট্রিডিয়াম ভ্যাকসিন ২.৫ মিলি, চামড়ার নীচে নেওয়া যায় ৩ মাসের বেশী বয়স হলে। ১৪ দিন বাদে পুনরায় নিতে হয়, তারপর প্রতি বছর নিতে হয়।

✶ এঁসো রোগ ঃ

এটি ভাইরাস ঘটিত খুব সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ। ছাগল/ভেড়া সহ সমস্ত চেরা খুরযুক্ত প্রাণী এই রোগে আক্রান্ত হয়। তবে গরুর মত ছাগল/ভেড়া এই রোগে তীব্রভাবে আক্রান্ত হয় না। রোগাক্রান্ত প্রাণীর মুখে ও পায়ে (খুর) ঘা এই রোগের প্রধঅন লক্ষণ, এই জন্য এই রোগকে ফুট এবং মাউথ ডিজিজ (Foot & Mouth disease) বলে। বিশেষত বর্ষার সময় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। এবং খুব দ্রুত অন্যান্য ছাগলের/ভেড়ার মধ্যে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

রোগের লক্ষণ ঃ প্রাথমিক অবস্থায়। প্রাণীটির প্রবল কাঁপুনি দিয়ে জর আসে (১০৪-১০৬° ফারেনহাইট), জিভের ওপরে জলভরা ফোস্কা ফেটে গিয়ে লাল হয়ে যায় এবং জ্বর ধীরে ধীরে কমতে থাকে। জিভে ঘা হওয়ার জন্য ছাগল/ভেড়া খেতে পারে না। ক্ষুরের ফাঁকে ঘা হয়, ছাগলের/ভেড়ার চলতে অসুবিধা হয়, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে থাকে। ছাগলের/ভেড়ার প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায় ও গর্ভধারণ ক্ষমতা কমতে থাকে। ছাগলের/ভেড়ার দুধ উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।

প্রতিকার ঃ রোগটি ভাইরাসঘটিত হওয়ায় এই রোগের বিশেষ কোন চিকিৎসা নেই, সাধারণত লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা করা হয়। ১ শতাংশ পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট বা ফটকিরির জল দিয়ে মুখের ঘা পরিস্কার করে ফেলতে হবে। এরপর বোরোগ্লিসারিন মলম (Boro-glycerin) লাগাতে হবে। পায়েৰ ঘা ২ শতাংশ কপার সালফেট জল দিয়ে ধুয়ে জীবানুনাশক মলম যেমন—সোরিন, হিমাক্স (Himax) লাগাতে হবে।

এই পদ্ধতি দিনে তিন থেকে চার বার করতে হবে। পায়ের ঘায়ে মাছি বসে ডিম পাড়তে পারে, তা থেকে লার্ভা জন্মায়। তাই যাতে না মাছি বসতে পারে তার জন্য ড্রেসিং অয়েল বা Dressol লাগাতে হবে। এছাড়াও বাড়ীতে তৈরী ড্রেসিং ওয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে। এজন্য ১ ভাগ ইউক্যালিপটাস, ১ ভাগ তারপিন ওয়েল এভং ১৫-২০ ভাগ নারিকেল তেল একসাথে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার লাগাতে হবে।

ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং পা ও মুখের ঘা তাড়াতাড়ি ভাল হওয়ার জন্য যে কোন একটি ব্রডস্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। যেমন— অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, স্টেপট্রেপেনিসিলিন, অ্যাম্পিসিলিন ইত্যাদি।

এছাড়া নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী প্রতিষেধক ভ্যাকসিন দেওয়া প্রয়োজন। F.M.D. ওয়েল অ্যাডজুভেন্ট (EMD oil adjuvent) IVRL, ছাগল/ভেড়া প্রতি ৫ মিলি (I/M) বছরে দুবার দিলে এই রোগ থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। এই প্রতিষেধক বিশেষ করে বর্ষার আগে ও শীতের আগে নিলে এই FMD রোগ হয় না।

✶ ঠুনকো রোগ বা Mastitis ঃ

এটি সাধারণত ব্যাকটিরিয়া ঘটিত রোগ আবার কখনও কখনও ভাইরাস এবং ছত্রাকঘটিত রোগ হতে পারে। এই রোগ সংক্রান্ত ব্যাপারে পরীক্ষাগারে প্রচুর গবেষণা হলেও চিকিৎসা ব্যাপারে সঠিক পথের সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় না, এজন্য গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে।

রোগের লক্ষণ ঃ এই রোগে ছাগলের/ভেড়ার পালান, বাঁট শক্ত হয়ে যায়, যন্ত্রণা হয় এবং গরম হয়। জলের মত তরল বা ঘি-এর মত জমাট দুধ বের হতে থাকে, আবার কখনও বা ছাগলের/ভেড়ার জ্বর হতে থাকে, বাচ্চা দুধ পায় না।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ বাঁটের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভভ প্রয়োগ করতে হবে। ৪-৫ দিন কিছুটা ছানা দুধ অ্যাসেপটিক্যালি টেস্টটিউবের মধ্যে নিয়ে অ্যান্টিবায়োটিকের তুলনামূলক কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে পারলে ভাল হয়। সেখান থেকে আমরা জানতে পারবো কোন অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ সবচেয়ে বেশী কার্যকর হবে। অ্যান্টিবায়েঅটিক ঔষধ দিয়ে পরপর তিনদিন চিকিৎসা করলে (পেনডিসট্রিন এস এইচ) সেরে যায়। এর সঙ্গে সিস্টেমেটিক অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশান দিতে হবে। বাচ্চা হওয়ার পর মা ছাগলের/ভেড়ার পালান ও বাঁট কোন জীবানুনাশক ঔওষধ দিয়ে ধুলে এই রোগের আক্রমণ কম হয়।

✶ পেটফোলা বা ব্লোট (Bloat) ঃ

অনেক সময় নতুন সবুজ ঘাস প্রচুর পরিমানে খেয়ে ফেললে পেট ফুলে যায়, বা স্টার্চ জাতীয় খাবার ধান, চাল, ভাত, দানা জাতীয় খাদ্য, পচা মিষ্টি, অনুষ্ঠান বাড়ীর বেশী হওয়া ভাত বেশী পরিমাণে খেলে এই রোগ দেখা যায়। বদ হজমের জন্য পাকস্থলীতে অত্যধিক গ্যাস জমা হলে এই রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ হঠাৎ করে বাম পাশেৰ পেট ফুলে যায়। ছাগল/ভেড়া চীৎকার করে। খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে। পায়খানা, প্রস্রাব প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কখনও পাতলা পায়খানা, অল্প করতে থাকে। দম বন্ধ হয়ে যায়। শ্বাসকষ্ট হয়, ছাগল/ভেড়া শুয়ে ছটপট করতে থাকে। বেশি পেট ফুলে গেলে ছাগল/ভেড়া ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের মধ্যে মারা যায়।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ অত্যধিক পেট ফুলে গেলে পেটের ভেতর থেকে অতিরিক্ত গ্যাস বের করতে হবে ট্রোকার ক্যানুলার দ্বারা। তাছাড়া ভিটামিন বি, ইনজেকশন দিলে কার্বোহাইড্রেট হজম ভাল হয়। এক কাপ তিসির তেল খাইয়ে দিলে ছাগল/ভেড়া কিছুটা স্বস্তি পায়। তাছাড়া ব্লোটোসিল ২০ মিলি ১২ ঘন্টা অন্তর খাইয়ে দিলে ছাগল/ভেড়া কিছুটা স্বস্তি পায়। এছাড়া ছাগল/ভেড়া প্রতি ৮ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট বা ম্যাগনেশিয়াম ট্রাইসিলিকেট জাতীয় অ্যান্টাসিড খাওয়ানো যেতে পারে। পায়খানা বন্ধ সারানোর জন্য মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রয়োজন হলে নর্মাল স্যালাইনের সঙ্গে সোডিবাইকার্ব মিশিয়ে শিরাতে ইনজেকশন দিতে হবে। ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক দিলে পেটের ভিতর ফারমেনটেশন কম হবে, এরজন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মত কাজ করা উচিত। অন্যথায় ছাগল/ভেড়া মারা যেতে পারে। কচিঘাস বা সুবাবুল পাতা বেশী করে খাওয়ানো উচিত নয়।

✶ তড়কা বা Anthrax ঃ

সমস্ত প্রাণীর মত ছাগল/ভেড়াও এই রোগ থেকে নিস্তার পায় না। বেসিলাস অ্যানথ্রাসিস (*Bacillus anthrasis*) নামক ব্যাকটিরিয়া এই রোগের কারণ।

লক্ষণ ঃ আক্রান্ত প্রাণীটি কোন লক্ষণ প্রকাশ করার পূর্বেই মারা যায়। মারা যাওয়ার পর নাক, মুখ, পায়ু ইত্যাদি দ্বারা কাঁচা রক্ত বেরিয়ে আসে। কখনও কখনও পেট ফুলে যায়। মলদ্বারও ফুলে যায়। আক্রান্ত প্রাণীটি বেঁচে থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় জ্বর হয় (১০৪-১০৭° ফারেনহাইট)। খাওয়া দাওয়া, জাবরকাটা, সমস্ত বন্ধ করে দেয়। কাঁপতে থাকে এবং শরীর টলতে থাকে। পাতলা পায়খানার সাথে রক্ত বের হয়। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। তারপর ছাগল/ভেড়া মাটিতে পড়ে যায় এবং খিঁচুনি শুরু হয়।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ পেনিসিলিন ইনজেকশান দিলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, স্ট্রেপ্টোপেনিসিলিন, অ্যাম্পিসিলিন দিলে উপকার হয়। নিয়মিতভাবে টীকা (Vaccine) দিলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়। অ্যানথ্রাক্স স্পোর ভ্যাকসিন (Anthrax spore vaccine) ছাগল/ভেড়া প্রতি ১ মিলি চামড়ার নীচে ইনজেকশান, বছরে একবার দিতে হবে।

✶ গলাফোলা বা Haemorrhagic Septicaemia or H.S. ঃ

এটি একটি ব্যাকটিরিয়া ঘটিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এই রোগ গরু, মহিষ প্রভৃতি প্রাণীর বেশী হলেও ছাগলের/ভেড়ারও এই রোগ হয়। *Pasteurella multocida* নামক ব্যাকটিরিয়া এই রোগের জীবানু।

লক্ষণ ঃ আক্রান্ত প্রাণীর প্রবল জ্বর আসে (১০৪°-১০৭° ফারেনহাইট)। প্রাণীটি ঝিমোতে থাকে। মাংসপেশী ক্রমশঃ কাঁপতে থাকে। খাওয়া ও জাবর কাটা প্রায় বন্ধ করে। চোয়ালের নীচের দিকে নেমে সারা মুখ ফুলে যায়। রক্তযুক্ত পাতলা পায়খানা হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগাক্রান্ত প্রাণীটি মারা যায়।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ চিকিৎসা শুরুর আগেই অধিকাংশ আক্রান্ত ছাগল/ভেড়া মারা যায়। সেজন্য চিকিৎসার দ্রুত শুরু করা দরকার। স্টেপট্রোপেনিসিলিন, অওাম্পিসিলিন প্রভৃতি ঔষধ সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করলে প্রাণীটি বাঁচতে পারে।

বছরে একবার বর্ষার আগে ভ্যাকসিন দিলে এই রোগ সাধারণত হয় না। H.S. Vaccine (IVRI) ২ মিলি চামড়ার নীচে দিতে হবে। বাদলা ও গলাফোলা রোগের যুগ্মভাবে টীকা পাওয়া যায়।

✶ বাদলা বা Black Quarter (B.Q.) ঃ

এটি একটি ব্যাকটিরিয়াঘটিত সংক্রামক রোগ। *Clostridium chauvoei* নামক ব্যাকটিরিয়া এই রোগের জীবাণু। গরু ও মহিষ সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়। তবে ছাগল/ভেড়া এই রোগে আক্রান্ত হয় কিন্তু তা অনেক কম।

রোগের লক্ষণ ঃ প্রাথমিক অবস্থায় প্রাণীটির প্রবল জ্বর আসে (১০৫°-১০৭° ফারেনহাইট) এরপর পিছনের বা কখনও কখনও সামনের পা খোঁড়াতে থাকে। পা কাঁপে থরথর করে। শ্বাস কষ্ট হয়। পিঠ বাঁকিয়ে থাকে। মাংস পেশীতে চাপ দিলে কচকচ বা বজবজ শব্দ করে। এই লক্ষণ বেশী দেখা যায় পেছনের পায়ের পেশীতে, গলায়, পালান প্রভৃতি জায়গায়। এইজন্য এই রোগকে বজবজে কাত বলে। ২-৩ দিনের মধ্যে আক্রান্ত প্রাণীটি মারা যায়। বা অনেক সময় রোগরূপ লক্ষণ ছাড়াই আক্রান্ত প্রাণীটি মারা যায়।

চিকিৎসা পদ্ধতি ঃ এই রোগের চিকিৎসা যথাসম্ভব শীঘ্র করা উচিত। কারণ রোগের লক্ষণ প্রকাশেৰ ২-৩ দিনের মধ্যে প্রাণীটি মারা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় পেনিসিলিন, নির্দিষ্ট পরিমাণ ইনজেকশান করতে হবে। বছরে একবার করে প্রতিষেধক ভ্যাকসিন দিলে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। মাত্রা (B.Q. Vaccine, IVRI) ছাগল/ভেড়া প্রতি ২ মিলি চামড়ার নীচে দিতে হবে।

✶ রিন্ডার পেস্ট (Rinderpest) ঃ

গৃহপালিত সমস্ত প্রাণী এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এটি একটি ভাইরাস ঘটিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ।

রোগের লক্ষণ ঃ আক্রান্ত প্রাণীটির প্রবল জ্বর হয় (১০৫°-১০৭° ফারেনহাইট)। ঠোঁটের ভিতর, জিভের উপর, তালুতে ফুসকুড়ি বেরোতে থাকে। পরে ঘর্ষণের জন্য ঘায়েতে পরিণত হয়। চোখ লাল হয়ে যায় এবং পিঁচুটি কাটতে থাকে। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য পরে পাতলা পায়খানা হতে থাকে। পায়খানা খুবই দুর্গন্ধযুক্ত, পাতলা পায়খানা শুরু হলে জ্বর কমতে থাকে। আক্রান্ত প্রাণীটির খাবারের প্রতি অনীহা থাকে।

রোগের চিকিৎসা ঃ সাধারণভাবে এই রোগের কোন সুচিকিৎসা নেই। রোগের উপসর্গ দেখে চিকিৎসা করা যেতে পারে। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ব্রডস্পেকট্রাম জাতীয় ঔষধ নির্দিষ্ট মাত্রায় ইনজেকশান করতে হবে। খাওয়া বন্ধ করলে ডেকট্রোজ (Dextrose saline) ও পাতলা পায়খানা বন্ধ করার জন্য Kaolin বা Astringent পাউডার দিলে ভাল কাজ হয়।

আমাদের দেশে রিন্ডারপেস্ট রোগের প্রকোপ অনেক কমেছে, তবে যে সব অঞ্চলে এই রোগ বেশী দেখা যায় সেখানে Vaccine দেওয়া দরকার। C.T.V. Rinderpest Vaccine IVRI - ১ মিলি চামড়ার নীচে ইনজেকশান দিতে হবে। একবার এই টীকা দিলে ৪-৫ বছর এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

✶ ব্রুসেলোসিস (Brucellosis) ঃ

এটি একটি ব্যাকটিরিয়া ঘটিত রোগ। *Brucella meletansis* জীবানু এই রোগের জন্য দায়ী। গর্ভবতী ছাগলের/ভেড়ার শেষ পর্যায়ে গর্ভপাত ঘটায়। ছাগলের/ভেড়ার অস্তিসন্ধি ও জননগ্রন্থি ফুলে যায়।

প্রতিকার ঃ Brucella Strain - 19 vaccine - ১ মাসের মধ্যে ছাগল/ভেড়াছানাকে দিতে হবে। পরবর্তী vaccine ছয়মাস বয়সের ছাগল/ভেড়া ছানাকে দিতে হবে।

✶ মাইকোপ্লাজমা (Mycoplasma) ঃ

প্রায় সব জায়গাতেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই রোগে মৃত্যুর হার অনেক বেশী।

লক্ষণ ঃ এই রোগে প্রথমে প্রবল জ্বর ও সর্দি হয়। নাক দিয়ে জল পড়এত থাকে। দুগ্ধবতী ছাগলের/ভেড়ার স্তন ফুলে যায় এবং আক্রান্ত ছাগলের/ভেড়ার গাঁট ফুলে যায় ও প্রদাহ শুরু হয়। অস্থিসন্ধি ফুলে যায়, প্রদাহ শুরু হয়। ছাগল/ভেড়া হাঁটতে পারে না।

চিকিৎসা ঃ Telosin injection (২-৩ মিগ্রা/প্রতি কেজি) দিতে হবে। এবং অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, সেলাইনের সাথে শিরাতে দিলে, এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

✶ কোলিব্যাসিলোসিস ঃ

সাধারণত একমাস বয়সের মধ্যকার ছাগল/ভেড়া বাচ্চা এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। বেশী পরিমাণ দুধ খাওয়ার ফলে এই রোগ হয়। Ecoli আক্রমণ এই রোগের প্রধান কারণ। অত্যধিক মলত্যাগ, জলের মত পায়খানা, মলের সঙ্গে রক্ত থাকতে পারে। ধীরে ধীরে Bacterial toxin রক্তে প্রবেশ করে, বাচ্চার প্রবল জ্বর হয়। ২-৩ দিনের মধ্যে ছাগল/ভেড়া মারা যায়।

প্রতিকার ঃ যে কোন সালফার ড্রাগ বা অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ ফুরেক্সন, ফুরাডেনটিন, নিয়োমাইসিন নির্দিষ্ট মাত্রা দিলে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই সময় গরম জল খাওয়া উচিত, কম দুধ খাওয়াতে হবে। অধিক পায়খানা হলে নর্মাল সেলাইন দিতে হবে।

✶ পেস্টিডিস পেটিস-রুমিন্যান্ট (P.P.R) ঃ

বর্তমানে ছাগলের/ভেড়ার বহুল সংক্রামিত ভাইরাসজনিত রোগ, যা রিন্ডারপেষ্টের সঙ্গে সদৃশ। রোগটি প্রধানত মরবিলী ভাইরাস দ্বারা ছড়ায়, যা ছাগলে প্রচণ্ড মারাত্মক, সংস্পর্শ, দূষিত খাবার, জল, বিছানা এবং অন্যান্য বহিঃস্কৃত পদার্থ দ্বারা দ্রুত ছড়ায়।

লক্ষণ ঃ রোগটি মূলত প্রধানত দুপ্রকার মারাত্মক ও স্বল্প ক্ষতিকারক। প্রথমক্ষেত্রে রোগটি প্রায় রিন্ডারপেষ্ট সদৃশ। মৃত্যুহার ৫০-৯০ শতাংশ। প্রধান লক্ষণ হল— প্রচণ্ড জ্বর, (১০৪-১০৫° ফারেনহাইট)। শুকনো মাড়ি, ক্ষুধামন্দা, চোখের পর্দা রক্তবর্ণ, নাসাক্ষরণ, হাঁচি, দুর্গন্ধ এবং শেষের দিকে পুঁজযুক্ত নারাক্ষরণ ও নিউমোনিয়া দেখা যায়। এক্ষেত্রে প্রাণী শ্বাসকষ্টে মারাও যায়। জ্বরের পর ডায়রিয়া দেখা যায় এবং মলের সঙ্গে রক্ত থাকে এবং অবশেষে প্রাণী মারা যেতে পারে জলের অভঅবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রধানত দেখা যায় ভেড়ায়। যেখানে উপরের লক্ষণগুলি স্বল্পমাত্রায় দেখা যায়। বেশীরভাগ প্রাণী ভাল হয়ে যায়। সামান্য কিছু মারা যায়।

চিকিৎসা ঃ এই রোগের কোন সঠিক চিকিৎসা নেই। তবে লক্ষণভিত্তিক যেমন—ডায়েরীরা, শ্বাসকষ্টের চিকিৎসা করতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিকও স্যালাইন ও হাইপার-ইমুন সিরাম দেওয়া যেতে পারে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। নতুন ছাগল/ভেড়া দেখে কিনতে হবে ও রোগগ্রস্থ ছাগল/ভেড়া না কিনলেও সঠিক চিকিৎসার পর পুরানে ছাগলের/ভেড়ার সঙ্গে মেশাবে। প্রতিরোধের টিস্যুকালচার রিন্ডার পেস্ট টীকা ৩ মাস বয়সে দিতে হবে। এছাড়া অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সব যথোপযুক্তভাবে নিতে হবে।

ছাগলের/ভেড়ার রোগ প্রতিরোধের কতকগুলি উপায়

ছাগলের/ভেড়ার বিভিন্ন রোগ লাভজনক চাষের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং ছাগল/ভেড়া চাষকে লাভজনক করতে হলে কতকগুলো সাধারণ উপায় মেনে চলা উচিত। তাছাড়া দিন দিন পশুচিকিৎসা ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে। সেইজন্য রোগ যাতে না হয় তার জন্য সবসময় লক্ষ্য রাখা উচিত। ছাগল/ভেড়া খামারকে রোগমুক্ত রাখতে নিম্নলিখিত পন্থা মেনে চলা উচিত।

★ যত্ন ও পরিচর্যা ঃ

- ছাগলের/ভেড়ার বাসস্থান ও তার আশপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। স্যাঁতসেঁতে বা ভেজা থাকলে বিভিন্ন রোগ যেমন কক্‌সিডিওসিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের প্রকোপ দেখা দিতে পারে। ছাগলের/ভেড়ার খাবার ও জলের পাত্র প্রতিদিন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।
- ছাগলের/ভেড়ার মলমূত্র সর্বদা পরিস্কার থাকবে। খাবারের পাত্র যেন নোংরা না হয়।
- ছাগলের/ভেড়ার উপযুক্ত বৃদ্ধি হওয়ার জন্য সুষম খাদ্য দিতে হবে। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়, তাই খাদ্যে ভিটামিন ও খনিজ লবণ (Mineral) দেওয়া প্রয়োজন।

- নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী ছাগলে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো দরকার, প্রয়োজন হলে পশু চিকিৎসালয়ে মাঝে মাঝে ছাগলের/ভেড়ার মল পরীক্ষা করলে ভাল হয়। যে সব অঞ্চলে কৃমির উপদ্রব বেশী সেই সব জায়গায় বর্ষার আগে ও পরে কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা দরকার। ঔষধ সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ না হলে ঔষধ কাজ করে না। আবার বেশী হলে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। সেই জন্য সঠিক মাত্রায় খাওয়ানো উচিত।
- বাহ্যিক পরজীবি ও কীটপতঙ্গ দমন করতে হবে।
- সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য টীকা বা vaccine দেওয়া দরকার। সাধারণত কোন একটি ছাগল/ভেড়াকে সমস্ত টীকা দেওয়া হয় না, কোন অঞ্চলে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তবেই সে অঞ্চলের ছাগল/ভেড়াকে টীকা দেওয়া হয়। তবে ছাগল/ভেড়াকে নিয়মিত ভাবে এঁসো (Foot & Mouth disease) এবং এন্টারোটক্সিমিয়া (Enterotoximia) রোগের এবং গোটপক্স (Goat Pox) রোগের টীকা দেওয়া দরকার। অন্যান্য রোগগুলির বিশেষ কোন টীকা লাগে না।

❖ সংক্রামক রোগ ঃ

আমাদের এখানকার আবহাওয়া ও জলবায়ুর জন্য এবং ভেড়ার দলগতভাবে থাকার জন্য বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ভেড়া পালনে প্রধঅন অন্তরায়। খামারে কোনরূপ সন্দেহ যুক্ত রোগের লক্ষণ দেখলে বা একসঙ্গে অনেক ভেড়া আক্রান্ত হলে নিকটবর্তী প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া সমীচিন। ভেড়ার সংক্রামক রোগগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

১। **তড়কা (Anthrax) ঃ** এটি একটি ব্যাকটেরিয়া ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস (Bacillus anthrasis) জনিত রোগ। ভেড়ার পশমে ব্যাকটেরিয়ার বীজ (spore) অনেক দিন (15 years) বেঁচে থাকতে পারে এবং মানুষে পর্যন্ত ছড়াতে পারে।

২। **বাদলা (Black quarter) ঃ** ক্লসট্রিডিয়াম সভয় (clostridium chauvoei) নামক ব্যাকটেরিয়া এই রোগের কারণ।

৩। **গুটিরোগ (Rinderpest) ঃ** ভাইরাস ঘটিত রোগ। বর্তমানে এর প্রাদুর্ভাব নেই বললেই চলে।

৪। **সীপ পক্স (sheep pox) ঃ** ভাইরাস ঘটিত রোগ। প্রধানত ছোট বয়সে বেশী হয়।

❖ **রোগের লক্ষণ ঃ** মুখে দুই পিছন পায়ের মাঝে, পালানে ছোট ফোস্কার মত যা হয়। জ্বর, ক্ষুদামন্দা, দুর্বলতা ইত্যাদি।

❖ **চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ঃ** কোন ফলপ্রসু চিকিৎসা নেই। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা যেমন যাতে বোরো জিঙ্ক লোশন, পটাশিয়াম প্যারম্যাঙ্গানেট, প্রোভিডোন আয়োডিন লাগানো যেতে পারে। প্রতিরোধ করার জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, অসুস্থ ভেড়াগুলিকে আলাদা রাখা গ্রহণযোগ্য।

৫। **ফুট রট (Foot Rot) ঃ** ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ। চামড়া বা খুরের কোন কাটা ছেড়ার মাধ্যমে এই জীবাণু সহজেই শরীরে প্রবেশ করে।

❖ **রোগের লক্ষণ ঃ** ভেড়া খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটবে, ভাল করে দেখলে খুরের মাঝে ঘা দেখতে পাওয়া যাবে। বাজে গন্ধ বেরোবে পা থেকে।

❖ **চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ঃ** ঘাগুলি ফরমালিন বা কপার সালফেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। ভেড়াগুলিকে কাদা বা জলের জায়গা থেকে দূরে রাখতে হবে।

৬। **গলাফোলা (Haemorrhagic scptieaemia)**

৭। **ঠুনকো (Mastitis)**

৮। **এঁসো (Foot and Mouth Disease)**

❖ **অন্যান্য রোগ ঃ**

নিউমোনিয়া (Pneumonia), পেটফোলা (Bloat), ডাইরিয়া (Diarrhoea) ইত্যাদি অন্যতম।

ভেড়াকে বিভিন্ন রকম রোগের হাত থেকে বাঁচাতে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করা দরকার—

১। সবসময় পরিচিত লোকের কাছ থেকে সুস্থ ভেড়া কিনবেন।

২। ভেড়ার বাসস্থানে যেন জল না দাঁড়ায় এবং বর্ষাকালে যেন বৃষ্টির ঝাপটা না লাগে।

৩। ভেড়া কোন রোগে আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে দল থেকে আলাদা করে রাখবেন।

৪। খামারে সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।

৫। ভেড়াকে নিয়মিত কৃমির ওষুধ খাওয়ানো দরকার।

৬। সময়মত দরকারী টিকা দেওয়া অত্যন্ত জরুরী (বাদলা, রিন্ডারপেষ্ট, গলাফোলা, এঁসো, তড়কা ইত্যাদি)

৭। নিয়মিতভাবে ঔষধ গোলা জলে স্নান করাতে হবে বাহ্যিক পরজীবীর হাত থেকে রক্ষা পেতে।

৮। ঘরে বেশী গাদাগাদি করে ভেড়া রাখা যাবে না। পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকা জরুরী।

৯। সর্বদা বিশুদ্ধ পানীয় জলের জোগান থাকা চাই।

বাংলার কালো ছাগল ও গাড়োল ভেড়ার পরজীবী রোগ ও তার নিরাময় এবং নিয়ন্ত্রণ ঃ

● কিছু গোড়ার কথা ঃ

ছাগল ও ভেড়া পালন আজকের দিনে একটি লাভজনক জীবীকার মাধ্যম। ছাগলকে ইংরেজিতে বলা হয় ‘Poor man’s cow’। ছাগল ও ভেড়া পালন সম্পর্কে কোনও কথা বলতে গেলে প্রথমেই খামারী ভাইয়েদের থেকে যে প্রশ্নটি সবার আগে উঠে আসবে তা-হল ছাগল ও ভেড়া পালনের উপকারিতা কী?

এই প্রশ্নের উত্তর অনেকেরই জানা আছে। তবুও আরও ভালোভাবে এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হবে যে ছাগল ও ভেড়া পালনের জন্য প্রথমেই অনেক অর্থের প্রয়োজন হয় না। যেহেতু এই প্রাণী একসাথে কয়েকটি বাচ্চার জন্ম দেয় তাই খুব কম সংখ্যক প্রাণী নিয়েই খামারীকরণ চালু করা যায়। এর জন্য বিশেষ ধরনের নির্মিত ফার্ম দরকার হয় না। সাধারণ বাড়ির আশে-পাশেই এই প্রাণীদের রাখা যায়। আর যদি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও গাড়োল ভেড়ার খামার চালু করা যায় তাহলে তো খুবই ভালো কারণ এদের পরজীবী রোগ সংক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম হয়। কারণ এদের পরজীবী রোগ প্রতিহত করার ক্ষমতা অনেক বেশি।

● চ্যাপ্টাকৃমি সংক্রমণ রোগ ঃ

ফেসিওলোসিস পরজীবীর নাম ঃ ফেসিওলা জায়গান্টিকা (Pasciola Gigantica)

সংক্রমণ কীভাবে হয়—

এই পরজীবী জলজ শামুকের (aquatic snail) দ্বারা সংক্রমিত হয়। এই পরজীবীর পুর্ণাঙ্গ দশা (adult) ছাগল ও ভেড়ার লিভার ও বাইল ডাক্ট-এর মধ্যে থাকে। পরজীবীর ডিম আক্রান্ত প্রাণীর পায়খানা দিয়ে বের হয়। ডিম ফুটে লার্ভা বের হয় এই লার্ভা শামুকের মধ্যে প্রবেশ করে আর বৃদ্ধিলাভ করে। এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লাভা শামুকের থেকে বের হয়ে আসে ও জলজ উদ্ভিদের উপর অথবা জল সংলগ্ন ঘাস ও অন্য উদ্ভিদের উপর সিস্ট আকারে থাকে। যখন প্রাণী এই সিস্ট যুক্ত উদ্ভিদ খায় তখনই প্রাণীদের মধ্যে এই রোগের সংক্রমন ঘটে।

রোগের লক্ষণ/উপসর্গ—

ভেড়ার ক্ষেত্রে এই পরজীবীর সংক্রণ অতিমাত্রায় হলে অ্যানথ্রাক্স-এর মতো উপসর্গ দেখতে পাওয়া যায়। আক্রান্ত ভেড়া হঠাৎ করে শুয়ে পড়ে ও মারা যায়। এই পরজীবী দীর্ঘদিন যাবৎ যাবৎ লিভার ও বাইল ডাক্টে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রাণী—

১. দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. খাওয়া কমিয়ে দেয়।

৩. দেখে মনে হবে প্রাণী একদম শুকিয়ে গেছে। একটু চাপ দিলেই আক্রান্ত প্রাণী শুয়ে পরে।

৪. দু'চোয়ালের মাঝে চামড়ার নীচে রস জমে ফুলে যায়। যাকে চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিভাষায় 'বট্‌ল জ' বলে।

নিরীক্ষণ ও রাগ নির্ণয়—

উপসর্গগুলো এই রোগ নির্ণয়ে অএনকটা সাহায্য করে। আণুবীক্ষণিক যন্ত্র দ্বারা গোবর পরীক্ষা করলে কৃমির ডিম দেখতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা—

প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ মতো এই পরজীবীর উপযোগী বিশেষ কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিৎ।

রোগ নিয়ন্ত্রণ (Disease Control)—

১. ছাগল ও ভেড়াদেরকে উঁচু জায়গাতে চড়াতে হবে। নীচু অথবা জলসংলগ্ন জায়গাতে চড়ানো উচিৎ নয়। কারণ জলসংলগ্ন জায়গার ঘাস, পাতায় কৃমির সিস্ট থাকে তাই সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

২. গোবর যেখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উচিৎ নয়। এতে পরজীবীর দশা ছড়িয়ে পরে। গোপর মাটিতে গর্ত কেটে প্রতিদিন ফেলা উচিৎ। কিছুদিন পর ওই গোবর পচে (fermented) হয়ে যায়। আর তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপের প্রভাবে পরজীবীর ডিম ও লাভা মরে যায়।

৩. পানের জন্য নদী, পুকুরের জল ব্যবহার করা উচিৎ নয়। নলের জল বা টিউব ওয়েলের জল খাওয়ানো উচিৎ। কারণ পুকুরের জল বা নদীর জলের উপর কৃমির সিস্ট দশা (metacercariac) থাকে।

❖ অ্যাম্ফিসটোমেসিস ঃ

পরজীবীর নাম ঃ প্যারাম্ভিসটোমাম, ফটাইলোফোরণ (Paramphistomum Cotylophoron etc.)

সংক্রমন কিভাবে হয়—

এই পরজীবী শামুকের দ্বারা সংক্রমিত হয়। পরজীবীর কিছু লার্ভাদাগার শামুকের মধ্যে বৃদ্ধি হয়। এই লার্ভাদশা শামুক থেকে বের হয়ে জলজ উদ্ভিদ ও ঘাসের উপর সিস্ট তৈরি করে। যদি ছাগল বা ভেড়া এই ঘাস ও উদ্ভিদ খেয়ে ফেলে তাহলে এই পরজীবীর সংক্রমন ঘটে।

রোগের লক্ষণ সমূহ/উপসর্গ—

বস্তুত এই পরজীবীর লার্ভা দশা সব থেকে ক্ষতিকারক। এদের লার্ভাদশা খাদ্য নালীর উপর ঘা তৈরি করে। বর্ষাকালে এই পরজীবীর সংক্রমণ বেশি হয়। প্রচণ্ড উদরের যন্ত্রণা হয়। ছাগল খুব চেঁচায়। প্রচণ্ড পিপাসার্ত থাকে। বার বার জল খায়। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ওঠা বসা করে। পাতলা পায়খানা করে। সেই পাতলা পায়খানার বিশ্রী গন্ধ থাকে। ছোট ছোট লাল রঙের পরজীবী পায়খানার সাথে বের হয়ে আসে কখনও কখনও।

রোগের নিরীক্ষণ ও রোগ নির্ণয়—

গোবর পরীক্ষা করে (অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা) পরজীবীর ডিম চিনে রোগ নিরীক্ষণ করা যায়।

চিকিৎসা—

প্রতিকার ঃ এই রোগের প্রতিকার ফেসিওলোসিস রোগের মতো।

● গোলকৃমি সংক্রমণ রোগ ঃ

❖ হিমন্‌কোসিস সংক্রমণ ঃ

পরজীবীর নাম ঃ হিমন্‌কাস কনটরটাস (Haemonchus contortus)

সংক্রমন কিভাবে হয়—

এই পরজীবী অন্য কোনও প্রাণী দ্বারা (শামুক, কীটপতঙ্গ) দ্বারা হয় না। পরজীবীর ডিম গোবরের সাথে বাইরে আসে। সেই ডিম ফুটে লার্ভা বের হয়। তৃতীয় লার্ভাদশা ঘাসের আগায় চড়ে থাকে। ছাগল, ভেড়া এই ঘাস খেলে এই পরজীবী রোগের সংক্রমণ হয়।

রোগের লক্ষণ সমূহ/উপসর্গ—

১. এই পরজীবী একাদিক্রমে পাকস্থলীর দেওয়ালে যে শিরা-উপশিরা আছে তার থেকে রক্ত শোষণ করে।প্রচণ্ড রক্তাপ্লতায় ভোগে। অ্যানিমিয়া এমন জায়গায় পৌঁছায় যে চোখের পাতার ভিতরের রক্ত ধুসর/সাদা হয়ে যায়।

২. প্রাণী খুবই দুর্বল হয়ে পরে। এই কথাটা মনে রাখতে হবে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও গাড়োল ভেড়া তুলনামূলক ভাবে এই কৃমি দ্বারা কম সংক্রমিত হয়।

৩. খুব বেশি সংক্রমন হলে অতিমাত্রায় অ্যানিমিয়া হয়। এর থেকে শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন কমে যায়। ফলে দু'চোয়ালের নীচে ত্বকের ভিতরে রস জমে ফুলে যায় (bottle jaw) যাকে 'বটল য' বলা হয়।

রোগের নিরীক্ষণ নির্ণয়—

১. আনুবীক্ষনিক যন্ত্র দ্বারা গোবর পরীক্ষা করলে কৃমির ডিম দেখতে পাওয়া যায়।

২. অনেক সময় গোবর পরীক্ষা না করেও শুধুমাত্র বাইরের লক্ষণসমূহ দ্বারা রোগ অনেকাংশে নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা—

প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ মতো কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা জরুরী।

রোগ নিয়ন্ত্রণ (Disease control)—

১. সংক্রমিত প্রাণীর চিকিৎসা জরুরী।

২. যে জায়গাতে পরজীবী আছে সেখানে প্রাণীদের চড়ানো চলবে না।

৩. জায়গা বদল করে করে (Rotational grazing) চড়ানো উচিৎ।

৪. গোবর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গর্ত করে ফেলা উচিৎ।

৫. গোয়ালের মেঝেতে ইউরিয়া জল (Urea water) ছড়িয়ে দিলে ডিম বা লার্ভা নষ্ট হয়ে যায়। সপ্তাহে একদিন গরম জল ছিটিয়ে দিলেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

● হুকওয়ার্ম (হুককৃমি) সংক্রমণ ঃ

❖ পরজীবী নাম ঃ বিউনোস্টোমাম **(Bunostomum)**

সংক্রমন কিভাবে হয়—

এই পরজীবীর অন্য কোনও প্রাণী দ্বারা (শামুক, কীটপতঙ্গ) সংক্রমন হয় না।

পরজীবী ঃ ডিম গোবরের সাথে বের হয়ে আসে। ডিম ফুটে লার্ভা বের হয়। এক্ষেত্রেও হিমনকাসের (Haemonchus) মতোই লাভার তৃতীয় দশা হল সংক্রমন দশা। মনে রাখতে হবে হিমনকাসের মতো এক্ষেত্রে খাবার বা পানীয় জলের সাথে লার্ভা সংক্রমন হয় না। লার্ভা নিজেই চামড়া ভেদ করে প্রাণীর শরীরে ঢুকে পড়ে (Active penetration)।

রোগের লক্ষণসমূহ/উপসর্গ—

১. এই পরজীবীও হিমনকাসের মতো একাদিক্রমে ক্ষুদ্রান্ত্রের (small intestine) দেওয়ালের শিরা, উপশিরা থেকে রক্ত শোষণ করে। অতিমাত্রায় রক্তাল্পতা (anemia) হয়।

২. প্রাণীর অতিমাত্রায় রক্তের মধ্যেকার প্রোটিন কমে যায়। ফলস্বরূপ দু'চোয়ালের মাঝের অংশে চামড়ার নীচে রস জমে যায় আর ওই জায়গাটা ফুলে যায়। যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় 'বটল য' (Bottle jaw) বলে।

চিকিৎসা—

প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ মতো নির্দিষ্ট কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা জরুরী।

রোগ নিয়ন্ত্রণ (Disease control)—

হিমনকাসের মতো ব্যবস্থা নিতে হবে।

● কৃমির সংক্রমণ থেকে প্রাণীদের বাঁচানোর কিছু সাধারণ ব্যবস্থা ঃ

১. ছাগল, ভেড়া ভালোভাবে খাবার দিতে হবে। চড়াতে হবে নিয়মিত। এটা জেনে রাখা দরকার যে প্রাণীর স্বাস্থ্য ভালো রাখলে রোগ সংক্রমন কম হয়।

২. প্রাণীদের একই জায়গাতে প্রতিদিন না চড়িয়ে চড়ানোর জায়গাটা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিন। সেই আলাদা আলাদ প্লটে বিভিন্ন দিনে চড়ানো উচিৎ (Rotational grazing)

A	B	C
D	E	F

৩. গোবর নির্দিষ্ট জায়গাতে গর্ত কেটে সেই গর্তে ফেলা দরকার। গোবর যেখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উচিৎ নয়। কারণ গোবরের মধ্য দিয়ে পরজীবীর ডিম বের হয়ে আসে আর তা ছড়িয়ে পরার সম্ভাবনা বেশি।

৪. যদি মনে হয় ফোন একটি নির্দিষ্ট জায়গাতে চড়ানোর জন্য পরজীবী সংক্রমন হচ্ছে তাহলে সেই জায়গাটা পুড়িয়ে ফেললে কৃমির ডিম ও লার্ভা নষ্ট হয়ে যায়। অথবা ভালোভাবে লাঙ্গল দিলেও ডিম বা লার্ভা মরে যেতে পারে।

৫. বসন্তকালে কৃমি সংক্রমন বেশি হয় (Spring rise)। সেই সময় দু'বার সিজনের মাঝে ও পরে কৃমিনাশক ঔষধ দেওয়া দরকার।

❖ ফিতাকৃমি সংক্রমণ রোগ ঃ

পরজীবীর নাম ঃ প্রধানত মনিজিয়া (Moniezia sp) পরজীবী

সংক্রমন কিভাবে হয়—

এই পরজীবীর ডিম বা দেহাংশে (segment) গোবরের সাথে বের হয়। ওই ডিম কিছু আনুবীক্ষণিক প্রাণী খায় এবং তাদের শরীরে সিস্ট তৈরি করে। ছাগল বা ভেড়া খাবারের সাথে ওই সিস্টযুক্ত আনুবীক্ষণিক প্রাণীকে খেলে এই কৃমির সংক্রমন হয়।

রোগের লক্ষণ সমূহ উপসর্গ ঃ বস্তুত এই ফিতাকৃমি বিশেষ কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু অসংখ্য ফিতা কৃমি একসাথে খাদ্যনালী থাকলে খাদ্যনালীর পাচন ঠিকমতো হয় না। খাদ্যর নির্যাস সবই কৃমি গ্রহণ করে নেয়। তাই কৃমি আক্রান্ত প্রাণী পুষ্টির অভাবে ভোগে।

নিরীক্ষণ ও রোগ নির্ণয়—

গোবর পরীক্ষা করে ফিতাকৃমির দেহাংশ বা ডিম (আনুবীক্ষণিক যন্ত্র দ্বারা) চেনা যায়।

চিকিৎসা—

প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ফিতাকৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা জরুরী।

❖ গিড (Gid) রোগ ঃ

পরজীবীর নাম ঃ টিনিয়া মাল্টিসেপ্‌স্‌ (Taenia multiceps)

সংক্রমন কিভাবে হয়—

এই ফিতাকৃমির পুর্নাঙ্গ (adult) দশা কুকুরের ক্ষুদ্রান্ত্রে থাকে। কুকুরের পায়খানার সাথে এই কৃমির ডিম বাইরে আসে ছাগল ও ভেড়া এই ডিম খাবারের খেলে তবেই ছাগল ও ভেড়ার শরীরে এই রোগের সংক্রমন হয়। যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে তা হল এই কৃমির লার্ভা ছাগল বা ভেড়ার মস্তিষ্কে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে।

রোগের লক্ষণসমূহ/উপসর্গ—

১. যেহেতু এই কৃমির লার্ভা মস্তিষ্কের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাই স্নায়ু রোগের লক্ষণগুলোই দেখতে পাওয়া যায়।

২. আক্রান্ত প্রাণী ভালোভাবে খায় না, পান করে না।

৩. চক্রাকারে ঘুরতে থাকে (Circling movement)।

৪. কখনও কখনও সোজা হয়ে শক্ত বস্তুর উপর মাথাটা রাখে।

চিকিৎসা—

প্রাণী চিকিৎসকের দ্বারা অস্ত্রোপচার করে লার্ভা দশা (cyst) বের করা অত্যন্ত জরুরী।

❖ প্রোটোজয়া সংক্রমণ রোগ ঃ

প্রোটোজয়া এক ধরনের এককোষী প্রাণী। এদের মধ্যে কিছু কোষী প্রাণী ছাগল, ভেড়ার রক্তে সংক্রমিত হয়ে ওখানেই বংশ বিস্তার করে।

পরজীবীর নাম ঃ ট্রিপানোসোমা (Trypanosoma) ব্যবেসিয়া (Babesia), থাইলেরিয়া (Theilerea), ট্রাইট্রাইকোমোনাস (Tritrichomonas)।

সংক্রমন কিভাবে হয়—

ট্রিপানোজয়া পরজীবী বিভিন্ন পতঙ্গ যারা প্রাণীদের রক্ত চুষে খায় তাদের দ্বারা সংক্রমিত হয়। যখন কোন সংক্রমিত রক্ত চোষা পতঙ্গ (Blood Ducking flies) একটি প্রাণী থেকে আরেক প্রাণীর রক্ত চোষে তখন একটি আক্রান্ত প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে সংক্রমন হয়। ব্যাবেসিয়া (Babesia) পরজীবী বহিঃ পরজীবী (ectoparasite) এঁটুলী (Tick) দ্বারা ছাগল ও ভেড়াতে সংক্রমিত হয়। সেই রকমই থাইলেরিয়া (Theileria) পরজীবীও এঁটুলী (Tick) দ্বারা সংক্রমিত হয়।

রোগের লক্ষণসমূহ/উপসর্গ—

যখন ট্রিপানোজমা পরজীবীর সংক্রমন ঘটে তখন নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখতে পাওয়া যায়—

১. জ্বর একটি প্রধান লক্ষণ।

২. প্রাণী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে প্রচণ্ড স্বাস্থ্যহানি হয়। একেবারে শুকিয়ে যায়।

৩. চোখের কোন থেকে জল বেরিয়ে আসে (loorymation)।

৪. যদি অনেকদিন ধরে রোগটি থাকে তাহলে কিছু স্নায়ূরোগের লক্ষণের মতো দেখা যায়। প্রাণী চক্রকারে ঘুরতে থাকে। ব্যবেসিয়া পরজীবীর ক্ষেত্রেও জ্বর, দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি দেখা যায়।

থাইলেরিয়া পরজীবীর ক্ষেত্রেও জ্বর, দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি দেখা যায়। তবে থাইলেরিয়া রোগের ক্ষেত্রে আরেকটি বিশেষ উপসর্গ দেখতেপাওয়া যায়, গলার কাছে গ্ল্যান্ড ফুলে যায়। (Swelling of preseapular lymph node)।

নিরীক্ষণ ও রোগ নির্ণয়—

ব্লাড স্মীয়ার পরীক্ষা করে রোগের জীবানু চেনা যায়।

চিকিৎসা—

প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চিকিৎসা করানো একান্ত জরুরী।

নিয়ন্ত্রণ—

১. ট্রিপানোজোমোসিস রক্ত চোষা পতঙ্গ (Blood sucking flies) দ্বারা সংক্রমিত হয়। তাই কীটনাশক পদার্থ প্রয়োগ করলে এই রক্তচোষা পতঙ্গে বংশবৃদ্ধি কমে যায় এবং সংখ্যা কমে যায়। তবে কীটনাশক পদার্থের ব্যবহার প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ মতো করা একান্ত জরুরী।

২. ব্যবেসিয়া (Babesia) এবং থাইলেরিয়া (Theileria) পরজীবী এঁটুলী দ্বারা সংক্রমিত হয় তাই এই রোগ নিয়ন্ত্রণ (control) করতে হলে এঁটুলীকে মারা একান্ত জরুরী। এঁটুলীকে মারা একান্ত জরুরী। এঁটুলীকে মারার জন্য বিশেষ পরজীবী নাশক ঔষধ (ectoparasiticidal agent) প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ব্যবহার করা উচিৎ।

❖ বহিঃপরজীবী ❖

উকুন এঁটুলী, মাইট (mite) ইত্যাদি। ছাগল ও ভেড়ার চামড়াতে দেখা যায়।

রোগের লক্ষণসমূহ—

এঁটুলী নিরবিচ্ছিন্নভাবে রক্ত চোষণ করে। তাই আক্রান্ত প্রাণী অ্যানিমিয়াতে ভোগে। তবে মনে রাখতে হবে খুব বেশি সংখ্যক এঁটুলী না থাকলে এই অ্যানিমিয়া সংকটজনক নয়। তবে সবথেকে চিন্তাজনক বিষয় হলো এঁটুলী যদি প্রোটোজয়া (Babesia Theileria) সংক্রমন করে। সেক্ষেত্রে প্রাণীর স্বাস্থ্যহানি। কম উৎপাদন ক্ষমতা (Production loss) ইত্যাদি হয়।

চিকিৎসা—

প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ মতো।

ভেড়ার টীকা দেওয়ার সময়সীমা ঃ

মাস	টীকা	পূর্ণবয়স্ক ভেড়া	৬ মাসের বাচ্চা
মে	এঁসো	১ মিলি (এস.সি)	½ মিলি (এস.সি)
জুন	রিন্ডারপেষ্ট	১ মিলি (এস.সি)	১ মিলি (এস.সি)
জুলাই	বাদলা	৫ মিলি (এস.সি)	২.৫ মিলি (এস.সি)
আগষ্ট	এঁসো	১ মিলি (এস.সি)	½ মিলি (এস.সি)

ছাগল ও ভেড়ার রোগ নিয়ন্ত্রণে দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ

দেশীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান (ITK) এবং একটি প্রদত্ত জাতিগোষ্ঠীর জন্য জ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা পরিচিত এবং অপরিচিত বিভিন্ন সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভিত্তি তৈরী করে।

ছাগল/ভেড়া ও ভেড়া প্রতিপালন একটি জীবিকা নির্বাহের উপায় বুদ্ধির পাশাপাশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠী গ্রহণ উন্নয়ন এবং হস্তক্ষেপ মাধ্যমে উদ্ভাবন বজায় রাখে। প্রাচীনকাল থেকেগরামের মানুষ সামাজিক ও আর্থিক সুবিধার জন্য ছাগল/ভেড়া পালন করে আসছেন। ছাগল/ভেড়াকে গরীব মানুষের গরু (Poor man's cow) বলা হয়। গ্রামীন অর্থনীতিতে ছাগলের/ভেড়ার ও ভেড়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান হল সঞ্চিত জ্ঞান, দক্ষতা ও স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত প্রযুক্তি। ছাগল/ভেড়া ভেড়া প্রতিপালন দেশীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান ঐতিহ্যগতভাবে যুক্ত। ছাগল/ভেড়া ভেড়া পালনে পূর্বপুরুষদের পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত উদ্ভাবনকে মূল্যবান নতুন প্রযুক্তি সহায়তা সঙ্গে মিশ্র করা প্রয়োজন। সনাতন জ্ঞান সময় পরীক্ষিত ও ছাগল/ভেড়া ও ভেড়ার পালনে ও রোগপ্রতিরোধে প্রযুক্তির মাত্রা বুঝতে গবেষণার মাধ্যমে মাত্রা এবং দিকনির্দিষ্ট পরিবর্তন দাবী রাখতে সাহায্য করে। সুতরাং দেশীয় উদ্ভাবনের রেনডিং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা অচল হতে চলেছে। বহুমুখী জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবায়নের সাথে, আমাদের প্রচেষ্টা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া-ভেড়া প্রতিপালনে ও রোগ নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে অর্জন করা যেতে পারে। দেশীয় জ্ঞান কৃতবাদের স্মৃতি ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সংরক্ষিত হয় এবং এটি গল্প, কবিতা, গান, লোকাচার বিদ্যা, নীতিকাব্যমূলক গ্রন্থবিশেষ, নাচ, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান স্থানীয় ভাষা, শ্রেণীবিন্যাস,প্রতিপালন, রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা, পশু প্রজাতি, সম্প্রদায় আইন আকারে প্রকাশ করা হয়। অন্যান্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন উপর কৃতবাদের উদ্ভাবনের প্রধান সুবিধার এটা সাফল্য বা অল্প খরচ বা কোন খরচ ছাড়াই সহজলভ্য। এই উদ্ভাবন সামাজিক ভাবে গ্রহণ যোগ্য অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক, স্থায়ী। কৃতবাদের উদ্ভাবন উৎসাহিত করে সক্রিয় কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণ মানুষ একে অপরের উপর আরও নির্ভরশীল। বিজ্ঞানসম্মতভাবে উন্নত প্রথায় ছাগল/ভেড়া ও ভেড়া প্রতিপালন ও তাদের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছাগল/ভেড়া ও ভেড়া রোগ নিয়ন্ত্রণে দেশীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান এর ব্যবহার নিচে বর্ণনা করা হল যেটি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক দ্বারা সৃষ্ট।

১। সালফার ও সারসন তেলের মিশ্রণ প্রয়োগ ঃ এটি ছাগল/ভেড়া ও ভেড়ার চর্মরোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। সালফারে তেল (৬৫ gm) ও সারসন তেল 250 ml ও সরচের তেল একসাথে মিশ্রিত করে ফোটানো হয়। এবং এই ফুটন্ত মিশ্রণটি ঠান্ডা করে ছাগল/ভেড়া ও ভেড়ার ক্ষত জায়গায় স্প্রে করা হয়। চাষীরা ভালো ফল লাভ করেন। (Khanna, 1967)

২। বাবলা গাছের পাতা, চিনি ও বানজাম (Banjam) গাছের বাকল থেকে প্রাপ্ত রস (Juice) এর প্রয়োগ ঃ পরজীবীর মধ্যে কৃমি ও প্রোটোজোয়া জনিত রোগ ছাগল/ভেড়া ও ভেড়ার প্রভূত ক্ষতি করে। গোলকৃমি ও ফিতাকৃমি চ্যাপ্টাকৃমি অ্যাম্ফিস্টোম। ছাগলের/ভেড়ার ক্ষুদ্রান্তে থাকাকালীন স্ফীত করে। বার বার পাতলা পায়খানার হওয়ার জন্য ছাগল/ভেড়া দুর্বল হয়ে হঠাৎ মারা যায়। তাই দেশীয় উপকরণ বাবলা পাতা, চিনি, বানজাম গাছের ছাল থেকে প্রাপ্ত রস ভালোভাবে মিশ্রিত করে ফোটানো হয় এবং এটি ঘন পদার্থ তৈরী হয় যেটি খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। (Danna, 1998)

৩। কুলপাইমেনি (Kulpaimenoi) (Acalipaindicasp) এর ব্যবহার ঃ

এই গাছটি ছাগল/ভেড়া ও ভেড়ার শ্বাসপ্রশ্বাস জনিত সমস্যার যেমন ঃ সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis) ও lung ulcers প্রতিরোধে সাহায্য করে। (Venkata subra manian in dira) গাছের মূল

থেকে প্রাপ্ত রস ও জলের সাথে মিশিয়ে এটিকে ছেঁকে নেওয়া হয়, তারপর এটি খাওয়ালে হয় (Dona, 1998)

৪। প্রাণী ক্ষতের ক্ষেত্রে কাঁচা হলুদের সাথে লেবু মিশ্রণ ঘটিয়ে সেটি ক্ষতের জায়গায় প্রলেপ লাগানো হয়। যে সনত্রেলাকায়ী রোগ প্রাদুর্ভাব হয়। সেখানে প্রতিষেধক হিসাবে কার্যকর করা হয়। ব্যবহৃত পেস্টটি সহজলভ্য ও সস্তা। বাহ্যিক আঘাতের দ্বারা ক্ষতস্থান সারানোর জন্য এটি খুবই কার্যকরী। তাছাড়াও মুসুর ডাল বেটে একটি পেস্ট তৈরি করে তার মধ্যে কাঁচা হলুদ মিশ্রিত করে প্রলেপটি লাগানো হয়। (Dona, 1998)

৫। অন্য ক্ষেত্রে যখন প্রাণীগুলির প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়, ঠিক মতো গরম হয় না, তখন 3-4টি ভিলামা (Bhilama) (Semecarpus an a cardium) এর বীজ/দানা খাওয়ানো হয়। (Gupta and Patel, 1992)

৬। কালোজিরে ও টপের মিশ্রণ প্রয়োগ ঃ- পরজীবিঘটিত রোগ যেহেতু লাভজনক ছাগল/ভেড়া ও ভেড়া কাচের ক্ষেত্রে একটি মুখ্য পরিপন্থী, তাই এটির রোগ নির্ধারণ করানো অতি আবশ্যক। কৃমি জনিত রোগের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কালোজিরে টপের সাথে মিশ্রিত করে প্রাণীগুলিকে খাওয়ানো হয়। এটি আদিবাসী কৃচবাদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। (Khatik, 1994)

৭। ভেলা (Vela) সীড়ের ব্যবহার ঃ- ভেলা বীজের ভালোভাবে পেস্ট করে তার সাথে ম্যাস্টার্ড কেক (Mustard cake) মিশিয়ে খাওয়ানো হয়, যাতে তারা ছোঁয়াচে রোগ দ্বারা সংক্রামিত না হতে পারে। আক্রান্ত প্রাণীর মল, মূত্র, লালা ও চোখ দ্বারা নিঃসৃত হয়ে পরিবেশকে সংক্রামিত না করতে পারে। (Dana, 1998)

৮। অনেক সময় এদের গায়ে ছোট ছোট ফোস্কা ও পুঁজ দেখা যায় সংক্রামিত রোগের কারণে। দেশীয় ভাগ আদিবাসীরা গরম আয়রন (Iron)এর দ্বারা এগুলিকে ফাটিয়ে দেয়। তারপর সেই জায়গাটি ভালোভাবে পরিস্কার করা হয় গরম জলে ফোটানো নিমপাতার সংমিশ্রণে (Sribvastava, 1982)

৯। তাছাড়া মধু ও লেবুর সংমিশ্রণে প্রলেপ তৈরী করে (yokegell) এর চিকিৎসা করা হয়। (Dona and Kaul, 1998)। তবে, 90% বেশী ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা ''Harjora'' (Vitis Quadrangularis) উদ্ভিদটি ভেষজ গুণাবলী সম্পন্ন ব্যবহার করে থাকেন যদি কোন কারণে প্রাণীগুলির সঙ্গে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। (Srivastava, 1982 and Dana, 1998).

১০। গনাদি প্রাণীকুলকে এঁচো রোগের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে নীলগিরি পর্বতমালার টোডা উপজাতি, তাদের প্রাণীকে মাকড়সার ডিম ও রাগী শস্যের চূর্ণ প্রয়োগ করতেন। এটি খুব প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল।

উপরে উল্লিখিত দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবস্থা ছাগল/ভেড়া ও ভেড়া ব্যবস্থাপনার সমস্যার মোকাবিলা খুবই টেঁকসই পদ্ধতি। এই ধরনের ব্যবস্থা কৃচক জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কার্যকর রোগ ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসাবে ব্যবহার করে। ভবিষ্যতে একই জ্ঞান ও প্রযুক্তি আরও নিঁখুত ও সঠিকভাবে করা যেতে পারে। যাতে তাদের পিছনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি, সেটা বিশ্লেষণ করে সঠিকভাবে বোঝা যেতে পারে। এটি সম্পূর্ণ হলে, এটি আরও পরিমার্জন এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঙ্গে মিশ্রিত করার দ্বারা তাদের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা উন্নতি করা সম্ভব হবে। সুদূর ভবিষ্যতে চাচের উন্নতির জন্য উপরে আলোচিত বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়।

৫

ছাগল ও ভেড়ার মাংসের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ

গ্রাম বাংলায় ছাগল ও ভেড়া পালন চিরাচরিত অন্যান্য প্রাণীপালন যেমন গরু, মহিষ ইত্যাদির তুলনায় ছাগল ও ভেড়া অনেক কম খরচে ও কম পরিশ্রম করে প্রতিপালন করা যায়। তাই ছাগলকে গরীব মানুষের গরুও বলা হয়। ছাগল ও ভেড়া প্রতিপালন করা হয় মূলত মাংস, দুধ, চামড়া ও ফাইবার বা লোমের জন্য এবং এর অধিক চাহিদা রয়েছে বাজারে। যদি সঠিক ও ভালো গুনগত মানের মাংস, চামড়া, লোম ইত্যাদি উৎপাদন করা যায় তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারেও এর বিপুল চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে মোট মাংস উৎপাদনের প্রায় এক চতুর্থাংশ আসে ছাগল ও ভেড়ার মাংস থেকে, বর্তমান যেভাবে পরিবেশের জলবায়ার পরিবর্তন হচ্ছে তাতে আগামী দিনে ছাগল ও ভেড়ার মাংসের চাহিদাও বাড়বে বর্তমানে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বাড়াতে গেলে ছাগল ও ভেড়াপালন সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে করতে হবে অর্থাৎ মাংসের উৎপান ও গুণগতমান ভাল করতে হবে, ভালো প্রজাতির ছাগল কিংবা ভেড়া সঠিক সময়ে প্রজনন, প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন, সময়মতো কৃমিনাশক ঔষধ ও টীকাকরণ করতে হবে তবেই খুব ভালো ও গুনগত মানের মাংস উৎপাদন করা যাবে। পাশাপাশি সঠিক মানের চামড়া ও শেষ প্রাণী সুমারী অনুযায়ী ভারতবর্ষে মোট ছাগলের সংখ্যা প্রায় ১৩৫ কোটি এবং ভেড়া ৬৫ কোটির (১৯তম প্রাণী সম্পদ সুমারী) লোম/ফাইবার পাওয়া যাবে, বর্তমানে জৈব ও কম চর্বিযুক্ত মাংসের চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে, অর্থাৎ আগামী দিনে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিতে আরো বেশি পরিমানে কাজে লাগিয়ে মানুষের উপযুক্ত ও স্বাস্থসম্মত মাংস উৎপাদনের জন্য ছাগল ও ভেড়ার মাংসের গুরুত্ব অপরীশীম। বিশেষ করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পৃথিবী বিখ্যাত বাংলার কালো ছাগলের মাংস ও চামড়ার প্রচুর চাহিদাও রয়েছে পাশাপাশি খুবই পরিচিত গাড়োল ভেড়ার মাংসের চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে এবং আগামীদিনে এর চাহিদাও আরো বাড়বে। যদি সঠিক ভাবে উৎপাদন করে সঙ্গে সঙ্গে সংরক্ষণ করে প্যাকেটজাত করা যায় তাহলে বিদেশের বাজারে রপ্তানি করে অধিক লাভ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ছাগল ও ভেড়ার মাংসের প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহণ ও প্যাকেটজাত করে দেশে ও বিদেশের বাজারে সঠিক দামে বিপনন করতে হবে।

ছাগলের মাংস, চামড়া ও লোম ছাড়াও আরও অনেক উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। যেমন শিং, খুর, রক্ত, বিভিন্ন অস্ত্র, গন্থি ইত্যাদির সঠিকভাবে প্রক্রিয়াকরণ করেও বাজারীকরণ করা যায়, যেগুলো আমরা

সাধারণত ফেলে দিই বর্জ পদার্থ হিসেবে। অর্থাৎ অধিক লাভের আশায় ছাগল ও ভেড়া প্রতিপালন করতে গেলে, ছাগলের দেহের ওজন/মাংসের উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং সঠিক ও গুণগত মানের চামড়া ও লোম যাতে পাওয়া যায় সে দিকে নজর দিতে হবে

রপ্তানীর দিক থেকে বর্তমানে ভারতবর্ষ সবচেয়ে বেশি পরিমানে ছাগল ও ভেড়ার মাংস বিদেশে রপ্তানী করে। প্রায় ২৩ হাজার মেট্রিক টন যার মূল্য প্রায় ৮৭০ কোটি টাকা রপ্তানী করেছে এবং আগামী দিনে এর চাহিদা আরও বাড়বে।

ছাগল ও ভেড়ার থেকে আরো একটি প্রাণীজাত দ্রব্য যেমন ছাগলের দুধ পাওয়া যায়, যদিও পরিমানে কম উৎপাদন হয় কিন্তু পুষ্টিগুণ অনেক বেশি অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন খনিজ লবণ থাকে, যা অনেক সময় বাচ্চাদের খাওয়ালে সহজে হজম হয় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে মাংসের পাশাপাশি ছাগল কিংবা ভেড়ার উল ফাইবারের চাহিদা বেড়েই চলেছে অর্থাৎ অধিক পরিমানে কর্পেট উল বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। যদি বিজ্ঞান সম্মতভাবে সঠিক উপায়ে ছাগল পালন করা হয় এবং প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ করে চামড়া, ফাইবার, উল বিদেশের বাজারে অনেক বেশি দামে বিক্রি করা যায়। যেগুলো, চর্ম শিল্পে যেমন দামি ব্যাগ, জুতো ও পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কাজে লাগে এছাড়াও ছাগলও ভেড়ার লোম থেকে দামি দামি ব্রাশ তৈরি করা হয়।

এছাড়াও বর্তমানে ভ্যালুজাত দ্রব্য হিসেবে ছাগল ও ভেড়ার মাংস ব্যবহার করা হয়। আমরা কিছু সচরাচর ছাগলের মাংস মর্টন বলি কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ছাগলের মাংসকে চিভন ও ভেড়ার মাংসকে মর্টন বলা হয় মাংসের পুষ্টিগত দিক থেকে ছাগল কিংবা ভেড়ার মাংসের খুব একটা প্রার্থক্য নেই। অর্থাৎ অনায়াসে ছাগলের মাংসের মতো ভেড়ার মাংসকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

অর্থাৎ আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ছাগল কিংবা ভেড়া পালন করি তা হল মূলত মাংসের জন্য। কিন্তু মাংসের পাশাপাশি ভালো গুনগত মানের ছাগলের দুধ, চামড়া, ফাইবার ইত্যাদির জন্য আরো, বেশি করে নজর দিতে হবে, তবেই আর্থিকভাবে প্রাণী পালকগণ বেশি লাভবান হবে।

৬

ছাগল/ভেড়া পালনের প্রকল্প

(১২টি স্ত্রী ছাগল/ভেড়া ও ১টি পুরুষ ছাগল/ভেড়া)

- সংস্থা/উপভোক্তার নাম ও পিতার নাম ঠিকানা ঃ
- প্রকল্পের অবস্থান ও ঠিকানা ঃ
- খামারে পালন ক্ষমতা ঃ ১২টি স্ত্রী ছাগল/ভেড়া ও একটি পাঁঠা
- প্রাণী পালন সংক্রান্ত পরামর্শ ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা ঃ
- প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ
- প্রাণীজাত দ্রব্যাদির বাজারীকরণের সুযোগ সুবিধা ঃ

(ক) স্থায়ী মূলধন ঃ

✶ জমি উপভোক্তা বা সংস্থার নিজস্ব	
✶ জমি তৈরীর ব্যয়	নেই
✶ **ঘর তৈরী**	
✶ **স্ত্রী ছাগলের/ভেড়ার ঘর**	
✶ মাথাপিছু ৭.৫ বর্গফুট হিসাবে ১২টি ছাগলের/ভেড়ার জন্য	৯০ বর্গফুট
✶ **পাঁঠার ঘর**	
✶ একটি পাঁঠার জন্য ২০ বর্গফুট হিসাবে	২০ বর্গফুট
✶ ছাগল/ভেড়াখানার জন্য ঘর	৬০ বর্গফুট
✶ আঁতুর ঘর	২০ বর্গফুট
মোট	**১৯০ বর্গফুট**

নির্মাণে ব্যয় ৪০.০০ টাকা প্রতি বর্গফুট	
হিসাবে ১৯০ বর্গফুটের জন্য	৭,৬০০.০০ টাকা
প্রতি ৬৫০.০০ টাকা হিসাবে ১২টি বক্‌রির মূল্য	৭,৮০০.০০ টাকা
১টি পাঁঠার মূল্য	৮০০.০০ টাকা
অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য	৫০০.০০ টাকা
মোট (ক)	**১৬,৭০০.০০ টাকা**

(খ) কার্যকরী মূলধন ঃ

✶ খাবারের জন্য ব্যয় ১৩টি প্রাণীর জন্য প্রাণী পিছু প্রতিদিন ২০০ গ্রাম করে ৬ মাসে ৪৬৮ কেজি × ৬.০০ টাকা প্রতি কেজি	২,৮০৮.০০ টাকা
✶ খাবারের জন্য ব্যয় ঃ ৩০টি ছাগল/ভেড়া ছানার জন্য প্রাণীপিছু প্রতিদিন ১০০ গ্রাম করে ৬ মাসে ৫৪০ কেজি × ৬.০০ টাকা/কেজি	৩,২৪০.০০ টাকা
✶ সবুজ ঘাস ও খড় কেনা বাবদ ব্যয়	১,০০০.০০ টাকা
✶ ওষুধ, টীকা, বীমা ইত্যাদি বাবদ ব্যয়	১,০০০.০০ টাকা
মোট (খ)	**৮,০৪৮.০০ টাকা**
অতএব, মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা (১৬,৭০০.০০ + ৮,০৮৪.০০)	= ২৪,৭৪৮.০০ টাকা

● অর্থের জোগান/উৎস ঃ

✶ তফশীলী জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক অনুদান/প্রান্তিক অর্থ	১০,০০০.০০ টাকা
✶ উপভোক্তা/সংস্থার নিজস্ব বিনিয়োগ	৭৪৮.০০ টাকা
✶ ব্যাঙ্ক ঋণ	১৪,০০০.০০ টাকা
মোট	**২৪,৭৪৮.০০ টাকা**

আয়-ব্যয়ের খতিয়ান ঃ

প্রথম বছরে আয় ঃ

✶ ৭-৮ মাস বয়স ১০-১২ কেজি ওজনের ৩০টি ছাগল/ভেড়া	
✶ বিক্রয় বাবদ প্রতি ৭০০.০০ টাকা হিসাবে	২১,০০০.০০ টাকা
✶ সার বিক্রয় বাবদ	১০০.০০ টাকা
✶ বস্তা বিক্রয় বাবদ	১০০.০০ টাকা
মোট	**২১,২০০.০০ টাকা**

অতএব, প্রথম বছরে মোট লাভ (২১,২০০.০০ – ৮,০৪৮.০০) = ১৩,১৫২.০০ টাকা

● দ্বিতীয় এবং পরবর্তী বছরগুলিতে ব্যয় ঃ

✶ খাবারের ব্যয় ১৩টি পূর্ণবয়স্ক প্রাণীর জন্য	
প্রতিদিন প্রাণী পিছু ২০০ গ্রাম করে এক বছরে	
মোট ৯৪৯ কেজি × ৬.০০ টাকা	
প্রতি কেজি সুষম খাদ্য	৫,৬৯৪.০০ টাকা
✶ খাবারের ব্যয় ৪৫টি ছাগল/ভেড়াছানার জন্য প্রতিদিন	
প্রাণীপিছু ১০০ গ্রাম করে ৬ মাসে	
মোট ৮১০ গ্রাম × ৬.০০ টাকা	
প্রতি কেজি সুষম খাদ্য	৪,৮৬০.০০ টাকা
✶ সবুজ ঘাস ও খড় কেনা বাবদ ব্যয়	২,০০০.০০ টাকা
✶ ওষুধ, টীকা, বীমা ইত্যাদি বাবদ ব্যয়	১,৫০০.০০ টাকা
মোট	**১৪,০৫৪.০০ টাকা**

● দ্বিতীয় এবং পরবর্তী বছরগুলিতে আয় ঃ

✶ ৭-৮ মাস বয়স ৪০টি ছাগল/ভেড়া বিক্রয় বাবদ	
প্রতিটি ৭০০.০০ টাকা হিসাবে	২৮,০০০.০০ টাকা
✶ প্রতিস্থাপিত ৩টি প্রাপ্ত বয়স্ক প্রাণী বিক্রয়	
বাবদ প্রতিটি ৬৫০.০০ টাকা হিসাবে	১,৯৫০.০০ টাকা
✶ সার বিক্রয় বাবদ	১০০.০০ টাকা
✶ বস্তা বিক্রয় বাবদ	১০০.০০ টাকা
মোট	**৩০,২৫০.০০ টাকা**

- **দ্বিতীয় এবং পরবর্তী বছরগুলিতে লাভ ঃ**

✶ মোট লাভ টাকা (৩০,২৫০.০০ – ১৪,০৫৪.০০)	১৬,১৯৬.০০ টাকা
✶ ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ বাবদ প্রদেয়	৩,০০০.০০ টাকা
✶ ব্যাঙ্ক ঋণের সুদ বাবদ প্রদেয়	১,৬৮০.০০ টাকা
✶ হাতে প্রাপ্তব্য লাভ	১১,৫১৬.০০ টাকা

ছাগল/ভেড়া পালনের মূল সূত্র

- সাধারণভাবে এদের বিশেষ কোনও বাসস্থানের প্রয়োজন নেই। সাধারণ ঘর তৈরী করে নিলেই চলে তবে মেঝেটা ইট দিয়ে তৈরী করলে ভাল হয়। বৃষ্টির জল যাতে ঘরে না আসতে পারে সেইভাবে ঘরের চাল তৈরী করতে হবে।
- প্রতি ছাগলের/ভেড়ার জন্য ১০ বর্গ ফুট, বড় পাঁঠার জন্য ২০ বর্গফুট এবং বাচ্চার জন্য ৪ বর্গফুট স্থান পেলেই যথেষ্ট। তবে গ্রামে সাধারণত ছাগল/ভেড়া সমস্ত দিন চরেই বেড়ায়, কাজেই সে সবক্ষেত্রে এইসব বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন হয় না।
- নিজেরা প্রজনন করালে প্রতি ৫০টি স্ত্রী ছাগলের/ভেড়ার জন্য ২টি পাঁঠার (পুরুষ) প্রয়োজন হবে।

খাবার ঃ

- উপযুক্ত ঘাসের ব্যবস্থা করতে পারলে ২৫টি ছাগল/ভেড়াকে ১ একর জমিতেই চাষ করা সম্ভব। তবে ঘাস তৈরী করতে জমি তৈরী করা, বীজ লাগান, এ সবের জন্য কিছু খরচ করতে হবে।
- ঘাসের সঙ্গে কিছু দানা খাবার দিলে ভাল হবে।
- বাচ্চার জন্য জন্মাবার পর ৩-৪ কিলো করে প্রতি মাসে বাচ্চাকে খাবার এবং মাত্র ১ মাস মায়ের দুধ অবশ্যই দিতে হবে। ১ মাস মায়ের কাছে রাখতে পারলে ভাল হয়।
- স্ত্রী ছাগলের/ভেড়ার জন্য গর্ভকালীন ও বাচ্চা দেবার পর ৬ কিলো করে প্রতিমাসে ৩ মাস দিতে হবে।

✶ **বাচ্চাদের অনুপাত ঃ**	৮৫ শতাংশ
পূর্ণতা প্রাপ্ত হবার বয়স	১২ মাস
বাচ্চাদেবার ব্যবধান	৮ মাস
মৃত্যুর হার ঃ বড়	৪ শতাংশ
ছোট	১৫ শতাংশ
যমজ বাচ্চার অনুপাত	৬০ শতাংশ
স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত	১ ঃ ১ শতাংশ

স্ত্রী বাচ্চা বাতিল করবার অনুপাত		
(পুং বাচ্চা ৬-৯ মাসের মধ্যে)	২০	শতাংশ
✶ বর্তমানে এখানে যে হিসাব দেখান হয়েছে তা এইরকম—		
ছাগলের/ভেড়ার দাম	৯০০.০০	টাকা
পাঁঠার দাম	১১০০.০০	টাকা
দানা খাবারের দাম (প্রতি কিলো)	৩.০০	টাকা
পুরুষ বাচ্চার বিক্রয় মূল্য	৮৫০.০০	টাকা
স্ত্রী বাচ্চার বিক্রয় মূল্য	৮০০.০০	টাকা
বাতিল করা মাদীর দাম	১০০০.০০	টাকা

মূলধনী খরচ ঃ

	সংখ্যা	**প্রতিটির দাম**	**মোট দাম**
বড় ছাগল/ভেড়া	৫০	৯০০.০০ টাকা	৪৫০০০.০০ টাকা
বড় পাঁঠা	২	১১০০.০০ টাকা	২২০০.০০ টাকা
		মোট	**৪৭,২০০.০০ টাকা**

খাবার খরচ	**সংখ্যা**	**পরিমাণ**	**দাম (প্রতি কিলো)**	**মোট দাম**
বড় ছাগল/ভেড়া	৫০	৬ কিলো/৩ মাস	৩.০০ টাকা	২৭০.০০ টাকা
বড় পাঁঠা	২	৭ কিলো/৩ মাস	৩.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা
বাচ্চা	৬৪	৪ কিলো/১ মাস	৩.০০ টাকা	৭৬৮.০০ টাকা
			মোট	**৩,৫৯৪.০০ টাকা**

বাচ্চা দেবার ক্রম ঃ

আরম্ভের সময়	**১ম বৎসর**	**২য় বৎসর**	**৩য় বৎসর**	
পাঁঠা	২	২	২	
ছাগল/ভেড়া	৫০	৪৮	৪০	মৃত্যুহার ৫ শতাংশ
নতুন ছাগল/ভেড়া	—	—	১০	
বাচ্চাদের সংখ্যা (পুং)	৩৪	৩৩	৩৪	
(স্ত্রী)	৩৪	৩৩	৩৪	

আরম্ভের সময়	১ম বৎসর	২য় বৎসর	৩য় বৎসর
মৃত্যুহার			
বড় ৫ শতাংশ	২	৩	০
পুরুষ বাচ্চা ১৫ শতাংশ	৫	৫	৫
স্ত্রী বাচ্চা ১৫ শতাংশ	৫	৫	৫
বিক্রয়			
পাঁঠা	০	০	০
ছাগল/ভেড়া	০	৫	৫
পুরুষ বাচ্চা	০	২৯	২৬-৫৫
স্ত্রী বাচ্চা	০	১৯	২৩-৪২
বিক্রয়যোগ্য প্রাণী			
পাঁঠা	০	০	
ছাগল/ভেড়া	০	১০	
পুরুষ বাচ্চা	০	৫৫	
স্ত্রী বাচ্চা	০	৪২	

বিক্রয়লব্ধ অর্থ

	সংখ্যা	১ম বৎসর	২য় বৎসর
ছাগল/ভেড়া	১০	০	১০,৫০০.০০ টাকা
পুরুষ বাচ্চা	৫৫	০	৪৭,৬৫০.০০ টাকা
স্ত্রী বাচ্চা	৪২	০	৩৩,৬০০.০০ টাকা
		মোট	**৯০,৮৫০.০০ টাকা**

সুতরাং, ২ বৎসরের আয় ৯০,৮৫০.০০ টাকা এবং ২ বৎসরে খরচ ঃ ৩,৫৯৪×২ = ৭,১৮৮.০০ টাকা

আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

ব্যবসায় মোট মূলধন ঃ ৪৭,২০০.০০ টাকা

পালনের জন্য খাবার খরচ

১ বৎসর - ৩,৫৯৪.০০ টাকা + ২ বৎসর - ৩,৫৯৪.০০ টাকা = ৭,১৮৮.০০ টাকা

বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঃ ৯০,৮৫০.০০ টাকা

২ বৎসরে মূলধন বাদ দিয়ে (৯০,৮৫০.০০ – ৪৭,২০০.০০) টাকা = ৪৩,৬৫০.০০ টাকা

ঐ পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে আমরা যদি ঘাস চাষ করি। ঘাস উৎপাদন করলে বৎসরে প্রায় ৯০০০.০০ টাকা করে হবে। কাজেই ২ বৎসরে মোট ৯০০০ × ২ = ১৮০০০.০০ টাকা খরচ হবে। সুতরাং (৪৩,৬৫০.০০ – ১৮,০০০.০০) টাকা = ২৫,৬৫০.০০ টাকা লাভের অঙ্ক দাঁড়াবে।

একটি ছোট ছাগল/ভেড়া খামারের 'স্কীম' (১০টি স্ত্রী ছাগল/ভেড়া + ১টি পাঁঠা)

ধরা যাক ঃ

- স্ত্রী ছাগল/ভেড়াগুলি গর্ভবতী অবস্থায় কেনা হয়েছে।
- সমস্ত স্ত্রী-ছাগল/ভেড়াগুলিই ভাল গুণ সম্পন্ন এবং এরা দুবছরে ৩ বার বাচ্চা দেয় এবং প্রতি বিয়ানে একাধিক বাচ্চা প্রসব করে।
- জন্মের সময় স্ত্রী ও পুরুষ ছাগলের/ভেড়ার অনুপাত ৫০ ঃ ৫০
- বাচ্চা ছাগলের/ভেড়ার মৃত্যু হার ১০ শতাংশ।
- প্রজননের কাজে ব্যবহৃত পাঁঠাটি ছাড়া সমস্ত পুরুষ ছাগল/ভেড়াগুলিকে ১ মাস বয়সে খাসি করা হয়েছে এবং প্রতি বছর তাদের ৬-৯ মাস বয়সে বিক্রি করা হয়েছে। পরবর্তীকালে খামারের আকার বাড়ানোর জন্য স্ত্রী-বাচ্চাগুলিকে খামারে পালন করা হয়েছে। একবছর বয়সে এই স্ত্রী ছাগল/ভেড়াগুলিকে প্রজনন করানো যাবে এবং তাদের ৪-৫ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।
- প্রতিটি বড় ও ছোট ছাগলের/ভেড়ার জন্য যথাক্রমে ১০ ও ৪ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। ঘর তৈরীর খরচ জানার জন্য জায়গার হিসাব প্রয়োজন।
- বাৎসরিক প্রয়োজনীয় ঔষধের দাম ৩০.০০ টাকা প্রতি বড় ছাগল/ভেড়া এবং ১৫.০০ টাকা প্রতি ছোট ছাগল/ভেড়া।
- ছাগলের/ভেড়ার গর্ভধারণকাল গড়ে ৫ মাস।
- প্রতিটি স্ত্রী-ছাগল/ভেড়া বছরে ২৫০ দিন গড়ে ০.৭৫ কেজি করে দুধ দেবে এবং ১১৫ দিন শুকনো থাকবে।
- ছাগল/ভেড়া খামার দেখাশোনার জন্য কোন মজুর ধরা হয়নি, খামারী নিজেই তা করেছেন এবং খামার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও মূলধন খামারীর নিজের।

● স্থায়ী মূলধন ঃ

✶ ছাগলের/ভেড়ার ঘর তৈরি ঃ

১১টি বড় ছাগল/ভেড়া ও ২০টি ভবিষ্যতের বাচ্চা

ছাগলের/ভেড়ার জন্য (১০×১১) + (৪×২০) = ১১০ + ৮০ = ১৯০ বর্গফুট

প্রতি বর্গফুটের জন্য খরচ গড়ে ৪০ টাকা ধরলে

মোট খরচ ১৯০ × ৪০ টাকা ৭,৬০০.০০ টাকা

✶ ছাগল/ভেড়া খামারের বিভিন্ন জিনিসপত্র ঃ

ছাগল/ভেড়া প্রতি ২০.০০ টাকা হিসাবে ২২০.০০ টাকা

✶ ১১টি ছাগলের/ভেড়ার দাম ঃ গড়ে ছাগল/ভেড়া প্রতি

৫০০ টাকা হিসাবে ৫৫০০.০০ টাকা

মোট **১৩,৩২০ টাকা**

● চলতি মূলধন (Recuring Expenditure) ঃ

✶ খাদ্য ঃ

দানাজাতীয় খাদ্য (স্ত্রী-ছাগলের/ভেড়ার জন্য) ঃ গর্ভাবস্থার শেষ মাস ও বাচ্চা দেওয়ার পর ২ মাস পর্যন্ত, ১০টি স্ত্রী-ছাগলের/ভেড়ার জন্য দৈনিক ২৫০ গ্রাম করে

২৫০ গ্রাম × ৯০ × ১০ = ২২৫ কেজি,

প্রতি কেজির দাম ৬ টাকা ধরলে ২২৫ × ৬ ১,৩৫০.০০ টাকা

✶ দানাজাতীয় খাদ্য (পাঁঠার জন্য) ঃ বছরে ৩ মাস প্রজননের

কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে দৈনিক ২৫০ গ্রাম হিসাবে মোট

২৫০ গ্রাম × ৯০ = ২২.৫ কেজি।

প্রতি কেজির দাম ৬ টাকা ধরলে ২২.৫×৬ ১৩৫.০০ টাকা

✶ সবুজ ঘাসজাতীয় খাদ্য (বড় ও ছোট ছাগলের/ভেড়ার জন্য) ঃ

বড় ছাগল/ভেড়া গড়ে দৈনিক ৩ কেজি করে এক বছরে খাচ্ছে

এবং দৈনিক ১ কেজি করে ৯টি পুরুষ বাচ্চা ৭ মাস

এবং ৯টি স্ত্রী-বাচ্চা এক বছর খাদ্যে।

এই হিসাবে মোট ঘাসের পরিমাণ

(৩×১১×৩৬৫) + (১×৯×২১৯) + (১×৯×৩৬৫) কেজি ১৭২ কুইঃ (প্রায়)।

অর্ধেক ঘাস ছাগল/ভেড়া মাঠে চরে খাবে ধরলে এবং প্রতি কুইন্টাল ঘাসের দাম ৩০ টাকা হিসাবে	২,৫৮০.০০	টাকা
✶ ঔষধের জন্য বাৎসরিক খরচ (৩০×১১+১৫×১৮)	৬০০.০০	টাকা
✶ বিদ্যুৎ, জল ও অন্যান্য খরচ	৬৫০.০০	টাকা
মোট	**৫,৩১৫.০০**	**টাকা**

● স্থায়ী মূলধনের বাৎসরিক মূল্য হ্রাস বা অপচয় ঃ

ছাগলের/ভেড়ার ঘর ও জিনিসপত্রের স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতির জন্য ও ছাগলের/ভেড়ার মোট অর্থনৈতিক আয়ু কমার জন্য স্থায়ী মূলধনের ওপর মূল্য হ্রাস, বছরে ১০ শতাংশ হারে ১,৩৩২ টাকা

● আয় ঃ

✶ ৬-৯ মাস বয়সের ৯টি পুরুষ বাচ্চা বিক্রি (মাংস ও চামড়া আলাদা করে অথবা জীবন্ত অবস্থায়) ৫০০.০০ টাকা প্রতি বাচ্চা হিসাবে ৪,৫০০.০০ টাকা		
✶ ৯টি স্ত্রী বাচ্চা যাদের খামারে পালন করা হচ্ছে তাদের আনুমানিক দাম, ৩০০.০০ টাকা প্রতি বাচ্চা হিসাবে	২,৭০০.০০	টাকা
✶ দুধ বিক্রি ঃ ১৮৭.৫ কেজি/ছাগল/ভেড়া × ১০ = ১,৮৭৫ কেজি প্রতি কেজি দুধের দাম ৮ টাকা হিসাবে	১৫,০০০.০০	টাকা
✶ ছাগলের/ভেড়ার বিষ্ঠা সার হিসাবে বিক্রি বাবদ	১০০.০০	টাকা
মোট আয়	**২২,৩০০**	**টাকা**

অতএব, বছরে মোট লাভ = মোট আয় - (চলতি মূলধন + স্থায়ী মূলধনের বাৎসরিক মূল্য হ্রাস) = ২২,৩০০.০০ – ৬,৬৪৭.০০ = ১৫,৬৫৩.০০ টাকা।
সুতরাং, মাসিক আয় = ১,৩০৪.০০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ - এইভাবে ছোট ছাগল/ভেড়া খামারের মাধ্যমে সহায়ক আয়ের পথ সুগম করা যায়। অভিজ্ঞতা বাড়লে খামারে জন্মানো স্ত্রী-ছাগল/ভেড়াগুলিকে প্রতিপালন করে খামারের আকার ধীরে ধীরে বাড়ানো যায় এবং এতে প্রতিবছরই আয়ের পরিমাণ বাড়বে।

বড় আকারের খামার করলে এবং খামারেই বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর ঘাস চাষ করে ছাগলের/ভেড়ার প্রয়োজনীয় খাবারের চাহিদা মেটালে খামার থেকে মাসিক আয় আরও বাড়ানো সম্ভব।

ছাগল/ভেড়া ও মাছ চাষের সুসংহত প্রকল্প (হেক্টর প্রতি)

● গোবর প্রতি হেক্টর বছরে	১৫ - ২০	টন
● গোবর প্রাণী পিছু বছরে	৪০০ - ৫০০	কেজি
● প্রতি হেক্টর প্রাণীর সংখ্যা	৪০ - ৫০	টি
● প্রতি হেক্টর মাছের চারা পোনা	৫০০০ - ৬০০০	টি

✶ উৎপাদন ঃ

মাছ বছরে হেক্টর প্রতি	৩ - ৫	টি
ছাগল/ভেড়া থেকে মাংস	৮০০ - ১০০০	কেজি
ছাগল/ভেড়া থেকে দুধ	২০০ - ৩০০	কেজি
মূলধন (আনুমানিক)	৭০,০০০.০০	টাকা

✶ গড় আয় (বছরে প্রতি হেক্টরে)

● মাছ থেকে	১,৩০,০০০.০০	টাকা
● প্রাণী থেকে	৭০,০০০.০০	টাকা
● আনুমানিক মোট আয় ঃ	২০,০০০,০০.০০	টাকা
● বছরে হেক্টর প্রতি আবর্তিত খরচ	১,০০,০০০.০০	টাকা
● বছরে হেক্টর প্রতি মোট লাভ	১,০০,০০০.০০	টাকা

পরিশিষ্ট

ভারত মূলত কৃষি প্রধান দেশ। কিন্তু কৃষি জমির স্বল্পতা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ইত্যাদি কারণে কৃষি নির্ভর জীবিকার সীমাবদ্ধতা হেতু বিকল্প জীবিকা হিসাবে কৃষির আরেক দিক - প্রাণী পালন আজ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষত ক্ষুদ্র, ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীদের কাছে প্রাণী পালন খুব জনপ্রিয়। সভ্যতার আদি লগ্ন থেকেই মানুষ ও প্রাণীর সহাবস্থঅন পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। প্রাণী ও মানুষের সম্পর্ক হল দাতা ও গ্রহীতার মত। বৈদিক যুগে প্রাণীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হত। মুসলিম ধর্মে মেষ পালনের মাধ্যমে জীবিকা ধারণের উল্লেখ আছে। আবার প্রভু যীশুর জন্ম হয়েছিল এক আস্তাবলে। সভ্যতার অগ্রগতিতে আজ প্রাণী পালনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রাণী পালন গরীব মানুষের কাছে এক বিশাল সম্পদ। সঠিক উপায়ে প্রাণীপালনে সংসারের পুষ্টি গত প্রয়োজনীয়তা যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি বিপদের সময় প্রাণী বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদ অর্থের যোগান হয়। আবার একত্রে সংখ্যায় অনেক চাষ করলে বেকারত্বের যুগে স্বনির্ভরতার দিশারী হয়ে ওঠে।

ছোট প্রাণী পালন আজ বেকার আর গরীব মানুষের কাছে আয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এক্ষেত্রে মূলধন লাগে কম, আয় হয় দ্রুত, ঝুকিও কম। তবে, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পালনের জন্য কতগুলি বিষয়ে নজর দিতে হবে।

১. সঠিক প্রাণী চয়ন।
২. প্রাণী আবাস স্থল নির্মাণ।
৩. প্রাণীর বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য সঠিক খাবারের যোগান।
৪. সঠিক পদ্ধতিতে প্রাণীর প্রজনন।
৫. প্রাণী থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাত করণ।

ছোট প্রাণী পালনের মধ্যে আমরা প্রধানত ছাগল ও ভেড়া পালনের ওপর গুরুত্ব দেব।

ছাগল ও ভেড়াপালন :

সাধারণত মাংস ও পশম উৎপাদনের জন্য ছাগল ও ভেড়া পালন করা হয়। সারা ভারতের মোট মাংস উৎপাদনের ৩৭% আসে ছাগল থেকে। ছাগলের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ৪.২৫% আর ভেড়ার ৩.১৬%। ছাগল ও ভেড়ার চাহিদা বেশী ও তুলনায় যোগান কম তাই পালন খুব লাভজেনক।

ছাগল ও ভেড়া নির্বাচন :

অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় আমাদের দেশীয় কালো ছাগল আর দেশী ভেড়ার বাচ্চা উৎপাদনের হার বেশী, রোগ, ব্যাধি কম, মৃত্যু হার কম, আর খুব কঠিন পরিস্থিতিতেও বেঁচে থাকতে পারে, তাই পালনে লাভ অনেক বেশি। ছাগল ও ভেড়া নির্বাচনের সময় নীচের বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখতে হবে।

- ❖ সাধারণত ১ বার বাচ্চা দিয়েছে - এমন স্ত্রী ছাগল/ভেড়া কিনতে হবে।
- ❖ তিন বিয়ানের বেশী বয়স্ক স্ত্রী ছাগল/ভেড়া কেনা উচিত নয়।
- ❖ প্রতি বিয়ানে ১ এর অধিক বাচ্চা দেয় - এমন স্ত্রী ছাগল/ভেড়া কিনতে হবে।
- ❖ প্রতি ২০টি ভেড়া/ছাগলের মধ্যে ১টি পুং ভেড়া/ছাগল ও ১৯টি স্ত্রী ভেড়া/ছাগল হতে হবে।
- ❖ সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে সুস্থ ও সবল ছাগল/ভেড়া কিনতে হবে।

ছাগল/ভেড়া সবসময় চাষীর বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে পালন করলে ভাল হয়। ছাগল/ভেড়া সংগ্রহের সময় যা লক্ষ্য করা জরুরী :

- ● ছাগল/ভেড়া সংগ্রহের ভালো সময় হল শীতের শেষ ও গরমের শুরু।
- ● ছাগল/ভেড়া সংগ্রহের পর তাকে ২১-২৮ দিন পৃথক ভাবে রাখতে হবে।
- ● এতে নতুন আনা ছাগল/ভেড়া থেকে রোগ সংক্রমণের ভয় কমবে।
- ● ছাগল/ভেড়া নিয়ে আসার পর তাকে শর্করা জাতীয় খাবার (গুড় জল) দিতে হবে।
- ● ২ ঘণ্টা পর তাকে সবুজ ঘাসের মাঠে চড়তে দিতে হবে।
- ● এই সময় ছাগল/ভেড়াকে কৃমি নাশক ঔষধ ও পি পি আর রোগের টীকা দিতে হবে।
- ● এই সময় কয়েক দিন ভিটামিন ও মিনারেল মিশ্রণ খাবারে মিশিয়ে দেওয়া ভালো।

ছাগলের/ভেড়ার পরিচর্যা

(ক) বিভিন্ন বয়সের পরিচর্যা (খ) বছরের বিভিন্ন সময়ের পরিচর্যা (গ) সাধারণ পরিচর্যা (ঘ) বিশেষ পরিচর্যা

১. শিশু ছাগলের/ভেড়ার পরিচর্যা
২. বাড়ন্ত ছাগলের/ভেড়ার পরিচর্যা
৩. স্ত্রী ছাগলের/ভেড়ার পরিচর্যা
৪. গাভীন ছাগলের/ভেড়ার পরিচর্যা
৫. পুরুষ ছাগলের/ভেড়ার পরিচর্যা

১. গ্রীষ্মকালের পরিচর্যা
২. বর্ষাকালের পরিচর্যা
৩. শীতকালের পরিচর্যা

১. বাসস্থান
২. খাদ্য
৩. প্রজনন

(ক) বিভিন্ন বয়সের পরিচর্যা :

১. জন্মের পর পরিচর্যা

- বাচ্চা প্রসবের পর মা যদি বাচ্চার সারা দেহ ও মুখ চেটে পরিস্কার না করে দেয় সেক্ষেত্রে পরিস্কার ন্যাকড়া দিয়ে বাচ্চার দেহ ও মুখ ভালোভাবে পরিস্কার করে দিতে হবে ও নাকে ফুঁ দিয়ে নাক পরিস্কার করে দিতে হবে। এতে সহজে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বাচ্চা সতেজ হয়ে ওঠে।
- জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে বাচ্চাকে গাঁজলা দুধ বা কোলোস্ট্রাম খাওয়াতে হবে এবং তা চলবে কমপক্ষে তিনদিন।
- বাচ্চা দুসপ্তাহের হলেই ঘাস খেতে শুরু করে। এসময় যাতে নরম ঘাস পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাচ্চাকে দিনের বেলা খোলামেলা জায়গায় রাখতে হবে। তবে গ্রীষ্মের দিনে গাছের নীচে বা ছায়ায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রথম মাসে বাচ্চার ওজনের ১/৬ অংশ দুধ প্রতিদিন খাওয়ানো দরকার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে দুধের পরিমাণ কমিয়ে দৈনিক বাচ্চার ওজনের ১/৪ এবং ১/১২ অংশ করে খাওয়ানো উচিত।

২. বাড়ন্ত ছাগলের/ভেড়ার পরিচর্যা

- পুরুষ ও স্ত্রী ছাগল/ভেড়াকে আলাদা করে রাখতে হবে।
- ছাগল/ভেড়া খাদ্যের অধিকাংশই মাঠে চরে যোগাড় করতে পারে।
- তবু অল্প পরিমান দানা খাদ্য রোজ দিতে হবে।

৩. স্ত্রী ছাগলের/ভেড়ার পরিচর্যা

- ছাগল/ভেড়াকে মুক্ত বাতাসে ছেড়ে রেখে পালন করতে হবে।
- সকালে ছাগল/ভেড়াকে পাঁঠার সামনে নিয়ে খেতে হবে। তাতে গরম হয়েছে কিনা বোঝা যাবে।
- ভাতের ফ্যানের সাথে সরিষার খৈল মিশিয়ে খেতে দিলে প্রজনন ক্ষমতা বাড়ে।

৪. গাভীন ছাগলের/ভেড়ার পরিচর্যা

- গাভীন ছাগল/ভেড়াকে পাঁঠার থেকে আলাদা রাখতে হবে।
- শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ছাড়াও কিছুটা বাড়তি খাদ্য দিতে হবে।
- গর্ভাবস্থায় শেষ দুমাসে প্রতিদিন ১৫০ গ্রাম করে দানা জাতীয় সুষম খাদ্য দিতে হবে।
- শেষ সপ্তাহে দানাজাতীয় খাদ্য কমিয়ে সবুজ ঘাস জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

৫. প্রজননক্ষম পুরুষ ছাগলের/ভেড়ার পরিচর্যা

- পুরুষ ছাগল/ভেড়াকে সকাল-বিকেল অন্তত দুঘণ্টা করে আলাদা ভাবে মাঠে চরানো দরকার।

- পর্যাপ্ত পরিমাণ সবুজ ঘাস খাদ্যের জন্য যথেষ্ট।
- প্রজনন ঋতুতে ঘাস ছাড়াও দৈনিক ২০০ গ্রাম করে দানা জাতীয় সুষম খাদ্য খাওয়াতে হবে।

(খ) বছরের বিভিন্ন সময়ের পরিচর্যা :

১. গ্রীষ্ম কালে ছাগলের/ভেড়ার পরিচর্যা

- দুপুরে রোদ থাকার কারণে সকালে ও বিকেলে ছাগল/ভেড়াকে চড়তে দিতে হবে।
- প্রখর রৌদ্রের সময় ছায়া যুক্ত জায়গায় রাখতে হবে।
- ছাগল/ভেড়াকে গ্রীষ্ম কালে অধিক পরিমানে পরিস্রুত জল খাওয়াতে হবে।
- পরিস্রুত জলে গুড় ও লবন মিশিয়ে দিনে ২ বার খাওয়াতে হবে।
- চরণ ভূমি থেকে ফেরার পর অন্তত আধ ঘণ্টা পরে জল খেতে দেওয়া যেতে পারে।

২. বর্ষাকালে ছাগলের/ভেড়ার পরিচর্যা

- বর্ষা চলাকালীন ছাগল/ভেড়াকে বাইরে ছাড়া চলবে না।
- কাটা ঘাস জলে ধুয়ে শুকনো করে ছাগল/ভেড়াকে খেতে দিতে হবে।
- যদি রোদ ওঠে ও ঘাস শুকিয়ে যায়, তখন ছাগল/ভেড়াকে বাইরে ছাড়া যাবে।
- ঘরের মেঝে শুকনো রাখতে হবে।
- বৃষ্টির জল যাতে ছাগলের গায়ে না লাগে সেদিকে নজর দিতে হবে।

৩. শীতকালে ছাগলের/ভেড়ার পরিচর্যা

- রোদ ওঠার ১-২ ঘণ্টা পরে ছাগল/ভেড়াকে মাঠে ছাড়তে হবে।
- ছাগল/ভেড়ার ক্ষুর যাতে শুকনো থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে।
- ছাগল/ভেড়াকে ঠান্ডা লাগানো চলবে না।
- ঠান্ডা বাতাসের হাত থেকে রক্ষা করতে ছাগল/ভেড়ার ঘরে পর্দা লাগাতে হবে।
- সন্ধ্যা নামার আগে ছাগল/ভেড়াকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে হবে।

(গ) সাধারণ পরিচর্যা

বিভিন্ন বয়সী ছাগলের/ভেড়ার বাস উপযোগী স্থান :

ছাগলের/ভেড়ার প্রকার	**বাস উপযোগী স্থান**
ছাগ/ভেড়া শিশু	০.২০ - ০.৩০ বর্গ মিটার
স্ত্রী ছাগল/ভেড়া	১.০০ বর্গ মিটার
স্ত্রী ছাগল/ভেড়া (গর্ভবতী)	১.৫০ - ১.৮০ বর্গ মিটার
প্রজননক্ষম পুরুষ ছাগল/ভেড়া	২.০০ বর্গ মিটার

স্বল্প খরচের উপকরণ দিয়ে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ছাগলের/ভেড়ার বাসস্থান নির্মাণ করা যেতে পারে :

- থাকার জায়গা পরিস্কার ও শুকনো রাখা বাঞ্ছনীয়।
- ঘরে স্বাভাবিক আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, বৃষ্টি ও ঠান্ডা যাতে না আসে সে রকম ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- খাবার ও জলের ব্যবস্থা ঘরের বাইরে রাখা উচিত।
- বাসস্থান উঁচু জায়গায় হওয়া উচিত।
- ভূমি থেকে মেঝের উচ্চতা ৩ ফুট হওয়া প্রয়োজন।
- মেঝে থেকে ঘরের উচ্চতা ১০-১২ ফুট।
- প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগলের/ভেড়ার জন্য গড়ে ১০-১২ বর্গ ফুট জায়গা দরকার।
- প্রতিদিন ছাগলের/ভেড়ার মল-মূত্র পরিস্কার করে ঘরকে শুকনো রাখতে হয়।
- প্রজননক্ষম পুরুষ ছাগলের/ভেড়াকে গর্ভবতী ও স্ত্রী ছাগলের/ভেড়ার সঙ্গে রাখা যাবে না।
- ছাদ - খড়, টিন, টালি, অ্যাসবেসটস ইত্যাদিকে ঘরের ছাদ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ঘরের দেওয়াল - মাটি, কাঠ বা বাঁশের দরমা দিয়ে দেওয়াল করা যেতে পারে।
- দেওয়ালের উচ্চতা ৮ ফুট হলে, উপরের ৫ ফুট তারজালি দিতে হবে - এতে হাওয়া চলাচল ভাল হবে।
- মেঝে মাটি থেকে একটু উঁচু হলে ভালো।
- মেঝেতে যেন জল জমে না থাকে।
- কংক্রিটের মেঝে হলে এক দিকে ঢাল রাখতে হবে।
- ও নর্দমা ব্যবস্থা ভালো হতে হবে।
- মাটি থেকে ২.৫ ফুট ওপরে কাঠের মাচা রাখা প্রয়োজন।
- মাচা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে।

খাদ্য

- ✓ বেঁধে পালন না করে চারনভূমিতে চড়িয়ে পালনই ভালো
- ✓ চারণভূমির ঘাস, দূর্বা, লতাপাতা, সবুজঘাস (গাইমুগ, স্টাইলো, নেপিয়ার, সিগন্যাল ইত্যাদি)
- ✓ উচ্ছিষ্ট ফল ও তরকারির খোসা (মূলা, গাজর, বীট, পালং, কপি, লাউ ইত্যাদি)
- ✓ শুকনো ঘাস/হে/ভূসি
- ✓ খড়/বিচালি - ছাটা ছাটা করে কাটা
- ✓ দানা জাতীয় খাদ্য : পুরুষ ছাগলকে - দৈনিক ২০০ গ্রাম করে বিশেষত ঃ প্রজননের সময় স্ত্রী ছাগলকে - দৈনিক ১০০ গ্রাম করে (বিশেষত ঃ প্রজননের সময়, প্রসবের আগের ১ মাস, বাচ্চা সঙ্গে থাকাকালীন ২ মাস)

প্রজনন :

- ✓ বাংলার কালো ছাগীকে ১০ মাস বয়সেই প্রথম প্রজনন করানো যায়।
- ✓ পাঁঠা ৬ মাস বয়সে প্রজননের ইচ্ছা প্রকাশ করে।
- ✓ তবে ১.৫-২ বছরের কম বয়সে পাঁঠাকে প্রজননে ব্যবহার না করাই ভালো
- ✓ প্রজননের জন্য ১০টি ছাগী পিছু একটি পাঁঠা রাখা প্রয়োজন।
- ✓ উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যা করলে একটি ছাগী ৫-৭ বছর এবং পাঁঠাকে ৩-৫ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।
- ✓ তবে একটি পাঁঠাকে একটি খামারে ১ বছরের বেশি প্রজননের কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়।

রোগের পরিচর্যা - ছাগল ও ভেড়ার নিম্নলিখিত রোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে :

১. পরজীবীজনিত (কৃমি, পতঙ্গ) রোগ
২. সংক্রামক (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, প্রোটোজোয়া) রোগ
৩. বিপাকীয় রোগ (মিল্ক ফিভার, কিটোসিস)
৪. পুষ্টির অভাবজনিত রোগ (রক্তাল্পতা, রিকেট)
৫. বিষক্রিয়া (কচি ঘামা ঘাস, কীটনাশক)
৬. অ্যালার্জি (রৌদ্র)
৭. জন্মগত রোগ (মলদ্বার না থাকা, যোনিদ্বার না থাকা, অতিরিক্ত বাট)
৮. বিবিধ রোগ (বার বার প্রজনন, টিউমার, পঁটফাপা, ফুল না পড়া)

(ঘ) বিশেষ পরিচর্যা

ডাস্টিং : পরজীবী নাশক পাউডার দূর থেকে স্প্রে করা। এর ফলে এঁটুলি, মাছি, ইত্যাদির সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পেট ভর্তি অবস্থায় ডাস্টিং করা উচিত, এতে ছাগলের মুখ দেবার প্রবণতা কমে।

ডিপিং : পরজীবী নাশক দ্রবণের মধ্যে ছাগল গুলিকে স্নান করানোর পদ্ধতি হল ডিপিং। পেট ভর্তি অবস্থায় দুপুরের দিকে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে ডিপিং করা উচিত।

ব্রাশিং : ছাগলের সমস্ত শরীর রোজ অন্তত ১ বার ব্রাশ করা উচিত। এতে রক্ত চলাচল ভালো হয় এবং ছাগলের চামড়অ ভালো থাকে। বাহ্যিক পরজীবীও কমে যায়।